দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

খ্রিস্টানরা মণিপুরকে হিন্দুশূন্য করতে চায়
— পৃঃ ২৩

তপ্ত মণিপুর এবং চিত্রাঙ্গদার সত্য সন্ধানটাও জরুরি
— পৃঃ ২৭

৭৫ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা।। ৭ আগস্ট, ২০২৩।। ২১ শ্রাবণ - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

মণিপুরে অশান্তির আড়ালে

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা, ২১ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

৭ আগস্ট - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

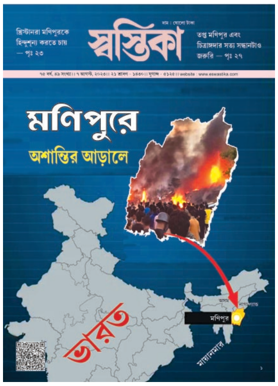

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

পালাবার পথ নাই তোর যম আছে পিছে

◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

মিড ডে মিলে যা পাচ্ছিস খা তোরা তো আর ভোটার নয়

◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

মণিপুরের বীভৎস হিংসার ঘটনাগুলি বেদনাদায়ক কিন্তু বিরোধীদের প্রতিবাদ নিতান্তই একপেশে

◻ স্বপন দাশগুপ্ত ◻ ৮

দেশের নৌ-প্রতিরক্ষায় ড্রোনের আমদানি কৃতিত্ব কলকাতার সংস্থার ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

মণিপুরকে দ্বিতীয় কাশ্মীর হতে দেওয়া যাবে না

◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ১১

খালিস্তানি আন্দোলনের ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা

◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ১৩

সিপিএম শুধু ভণ্ড নয়, এরা বর্বরও বটে ◻ অজয় সরকার ◻ ১৬

ভারতীয় আইন দ্ব্যর্থবোধক কেন? ◻ সৌম্যজিৎ মাইতি ◻ ১৮

মণিপুরকে হিন্দুশূন্য করার চক্রান্ত ◻ হীরক কর ◻ ২৩

তপ্ত মণিপুর এবং চিত্রাঙ্গদার সত্য সন্ধানটাও জরুরি

◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ২৭

পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্রহরণের দায় কি মুখ্যমন্ত্রী এড়াতে পারেন?

◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ২৯

সর্বভূতে ঈশ্বর জ্ঞানেই মেলে তাঁর দর্শন

◻ নন্দলাল ভট্টাচার্য ◻ ৩১

তন্ত্রসাধনা গুহ্য ও গুরুমুখী বিদ্যা

◻ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ৩৪

বাঙ্গলার রাম বাঙ্গালির রাম ◻ রবিব্রত ঘোষ ◻ ৩৫

ডেমোক্র্যাসি ইটার্স অব বেঙ্গল ◻ সুপ্রভাত বটব্যাল ◻ ৩৮

সেবা সাধনা : এক, একজন সত্যিকারের কর্মী অজিতজী ◻ ৩৯

অগ্নিশিশু ক্ষুদিরামের ছেলেবেলা ◻ দীপক খাঁ ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮ ◻ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে ১৪ আগস্ট, ২০২৩

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে ১৪ আগস্ট, ২০২৩

সার্ধশতবর্ষে শ্রীঅরবিন্দ

জন্ম ১৫ আগস্ট। স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগণ্য নায়ক। তাঁকে দেখলে মনে হয় এক ত্রিকালজ্ঞ ঋষি আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাদের অন্তর্মনের সব কথা পড়ে ফেলছেন। তিনি শ্রীঅরবিন্দ। একই সঙ্গে আলিপুর বোমার মামলার নায়ক এবং পণ্ডিচেরীর মহাশ্রমের মহানায়ক। এমন একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়।

লিখবেন— নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, ড. স্বাগত বসু, অমিত ঘোষদস্তিদার প্রমুখ

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সমস্যার মূল অনুধাবন করিতে হইবে

জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতা যে কত বড়ো বিপদ সৃষ্টি করিতে পারে তাহা বোধ হয় স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম অনুধাবন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কোনো লোক হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিলে সমাজে যে শুধু একটি লোক কম পড়ে তাহা নহে, একটি করিয়া শত্রু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের পক্ষে স্বামীজীর এই মহাবাক্যটি প্রমাণিত সত্য। দেশের মানুষ স্বধর্মচ্যুত হইয়া সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাইয়া দেশের বিভাজন ঘটাইয়াছে। তৎকালীন নেতৃবর্গ অরাষ্ট্রীয় শক্তির অন্যায্য দাবির নিকট মাথা নত করিয়াছিলেন। তাহাতে জাতির মস্তকে দেশ বিভাগের অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে। জেহাদি শক্তি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রক্তরঞ্জিত করিয়াছে সমগ্র দেশ। ফলস্বরূপ জাতি হীনবল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে কিন্তু দেশের সামাজিক, ধর্মীয় অথবা রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সুখনিদ্রা বিন্দুমাত্র বিঘ্নিত হয় নাই। জনসংখ্যার ভারসাম্যহীনতা স্বাধীন ভারতকেও বারবার রক্তরঞ্জিত করিয়াছে এবং অদ্যাবধি করিয়া চলিতেছে। নব্বইয়ের দশকের কাশ্মীরের ঘটনা দেশবাসীর স্মৃতিতে এখনোও জ্বলন্ত হইয়া রহিয়াছে। সমাজভ্রষ্ট বিধর্মী স্বদেশবাসীর হাতে লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, অপমানিত হিন্দুদিগকে নিজভূমেই পরবাসী হইতে হইয়াছে। শত শত কাশ্মীরি পণ্ডিতকে হত্যা করিয়া তাহাদের বাড়িঘর, সম্পত্তি দখল করা হইয়াছে। শত শত মা-বোনের সম্মানহানি করা হইয়াছে। উপত্যকা হিন্দুশূন্য করা হইয়াছে। রাষ্ট্রচেতনাহীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সেই অমানবিক ঘটনার প্রতিবাদে কোনোরূপ উচ্চবাচ্য না করিয়া ভোটের রাজনীতি করিয়া গিয়াছেন। যাহারা প্রতিবাদে মুখর হইয়াছিলেন তাহাদিগকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া দাগিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুধু কাশ্মীর নহে, দেশের বহু স্থানে জনসংখ্যার ভারসাম্য বিঘ্নিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিরও কয়েকটি জেলার জনসংখ্যা ভারসাম্য হারাইয়াছে। সেইসব এলাকার মূল নিবাসীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাদের গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া শহরে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। রাজ্যের ভোটভিখারি শাসক-প্রশাসক চক্ষু বন্ধ রাখিয়া ক্ষমতার মধু ভোগ করিতেছেন।

সম্প্রতি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মণিপুর রাজ্যটি জনসংখ্যার ভারসাম্য না হারাইলেও স্থানে স্থানে তাহা বিঘ্নিত হইবার কারণেই জাতিদাঙ্গার সৃষ্টি হইয়াছে। ভূমিপুত্রদের ন্যায্য অধিকারের বিরোধিতায় রাষ্ট্র বিরোধী শক্তির মদতে দাঙ্গা শুরু করিয়াছে অন্য সম্প্রদায়। ভোটভিখারি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং তাহাদের উচ্ছিষ্টভোগী সংবাদমাধ্যম সমস্যার গভীরে না যাইয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেই গালমন্দ পাড়িতেছে। সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে মণিপুরে বহু প্রাণহানি হইয়াছে, কয়েকটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা মোটেই সুখকর নহে। নারী নিগ্রহের ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া সমস্ত ররকমের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন। কেন্দ্রের নির্দেশে রাজ্য সরকার সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু মণিপুরের সমস্যা তো একদিনে শুরু হয় নাই। বহুদিন ধরিয়া মণিপুর-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খ্রিস্টান আধিপত্য বিস্তারের কাজ চলিয়াছে। তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার শুধুমাত্র ভোটের লোভে তাহা শুধু উপেক্ষা করে নাই, প্রকাশ্যে মদতও দিয়াছে। আজ মণিপুর জ্বলিতেছে, আগামীদিনে যে অন্যান্য রাজ্য জ্বলিবে না তাহার নিশ্চয়তা কেহ দিতে পারিবে না। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জনসংখ্যার ভারসাম্য বিঘ্নিত হইতে চলিয়াছে, অরাষ্ট্রীয় শক্তি বিচ্ছিন্নতাবাদের খেলায় মাতিয়াছে, তাহা কেহ পরিষ্কার করিয়া বলিতেছে না। মণিপুরকে হিন্দুশূন্য করিবার চক্রান্ত চলিতেছে তাহা কোনো বিরোধী দলের নেতা অথবা সংবাদমাধ্যম বলিতেছে না। সত্যকে অস্বীকার করিলে যে চরম মূল্য দিতে হয়, তাহার শিক্ষা রাষ্ট্রচেতনাহীন বিরোধীরা এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা গ্রহণ করিলেন না।

সম্প্রতি বিরোধীরা নূতন জোট তৈরি করিয়াছেন। তাহাদের লক্ষ্য কেবলমাত্র বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে গদিচ্যুত করা। তাহাদের মুখিয়া মণিপুরে নারী নিগ্রহের ঘটনায় চিৎকার করিতেছেন। নিজের রাজ্যে যে মণিপুরের সমগোত্রীয় একাধিক ঘটনা ঘটিতেছে তাহার কথা একবারও বলিতেছেন না। তাঁহার এত চিৎকার কি নিজের রাজ্যের ঘটনা আড়াল করিবার জন্য নয়? একই ঘটনা তো কেন্দ্র বিরোধী নূতন জোট শরিকদের শাসিত কোনো কোনো রাজ্যেও ঘটিয়া চলিতেছে। নিজেদের রাজ্যের অপকীর্তিকে আড়াল করিবার জন্যই যে বিরোধীদের এত চিৎকার এবং মণিপুর যাত্রা, তাহা দেশের মানুষের নিকট পরিষ্কার হইয়া পড়িয়াছে। সমস্যার মূলে যাইবার সদিচ্ছা তাহাদের নাই। দেশে উদ্ভূত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ সহমত হইয়া সমস্যার সমাধান করিতে হয়, ইহাই সুস্থ গণতন্ত্রের লক্ষণ। সমস্যার মূলে না যাইয়া শুধু দোষারোপ করিয়া সংসদ অচল করিয়া রাখাকে কোনোমতেই সুস্থ রাজনীতি বলা যায় না।

সুভাষিতম্

সর্পদুর্জনয়োর্মধ্যে বরং সর্পো ন দুর্জনঃ।
সর্পো দশতি কালেন দুর্জনস্তু পদে পদে।।

সাপ ও দুর্জনের মধ্যে সাপ বরং ভালো। কেননা সাপ কখনো কখনো দংশন করে কিন্তু দুষ্টলোক পদে পদে দংশন করে।

পালাবার পথ নাই তোর যম আছে পিছে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

লিখেছিলাম আজ নয়তো কাল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অভিযুক্তের তালিকায় উঠবে। কোনো অবাস্তব সেটিং তত্ত্ব কাজ করবে না। ইডি তার চার্জশিটে অভিষেকবাবুর নাম দিয়েছে। তার অনেক ধরনের ব্যাখ্যা ঘুরছে। কেউ বলছে এর কোনো দাম নেই। ইডি বলার জন্য বলেছে। কিছু করার জন্য নয়। তবে আশাবাদীদের ধারণা, যম এবার অভিষেকবাবুর পিছু নিল। তদন্ত সংস্থাদের নজরে তিনি কেবল সাক্ষী নন। অভিযুক্তও বটে। তৃণমূল বলছে ২০২৪-এ 'মোদী হটাও'। তার জন্য চিরশত্রু সিপিএম— কংগ্রেসকে নাকি তারা কাছে পেতে রাজি। অভিষেকবাবু কোনো অন্যায় করেননি— এটা অন্ধ ধারণা আর বিশ্বাস। ঠিক যেমন তৃণমূল-সিপিএম-কংগ্রেস এক অবিশ্বাস্য জোট। অনেকের ধারণা মমতাও তাই চান। তার চেয়ে হাস্যকর কিছু নেই। মমতা 'যখন যেমন তখন তেমন' রাজনীতির মানুষ। ২০২৪-এর মে মাসে লোকসভা ভোটের প্রাক-মুহূর্তে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান এখনই বলা অসম্ভব। তিনি নিজেও বলতে পারবেন না।

মমতার রাজনীতির ধরন ধারণ বোঝা তৃণমূল নেতাদের সাধ্য নয়। মমতা অন্য দলের অবস্থান বুঝে নিজের অবস্থান স্থির করেন। দলের জন্য কোনো নীতি বানান না। এটাই তার সাফল্যের চাবিকাঠি। মমতা প্রভু। দলের আপ্পা-আম্মা। বঙ্গ বিজেপি, কংগ্রেস বা সিপিএমের সে সুবিধা নেই। সকলের একটি করে প্রভু রয়েছে। দিল্লিতে থাকেন। কংগ্রেসের 'হাই কমান্ড', সিপিএমের 'পলিট ব্যুরো আর কেন্দ্রীয় কমিটি' আর বিজেপির 'সংসদীয় বোর্ড আর জাতীয় কর্মসমিতি'। এরপর অধীর চৌধুরী, মহম্মদ সেলিম ও শুভেন্দু অধিকারী বা সুকান্ত মজুমদারকে নিয়ে আলোচনা অর্থহীন। রাজ্য বিজেপির পুরোনো সৈনিক দিলীপ ঘোষ বাদ পড়ে গিয়েছেন। এটা শোনা যাচ্ছে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে পারেন। সব কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। মমতার ওসব বালাই নেই। যখন খুশি যেমন খুশি জোট গড়েন আর ভাঙেন। ২৬ দলের আইএনডিআইএ জোটেও মমতা প্রতীক হিসেবে রয়েছেন। চূড়ান্তভাবে নয়। রাজ্য বিজেপি সর্বস্তরে 'মমতা হটাও'-এর পক্ষে। সরাসরি না বললেও তার জন্য তারা সিপিএম বা কংগ্রেসের সঙ্গে অলিখিত এক বোঝাপড়ায় যেতে রাজি। ওটাও ধোঁয়াশা।

এটা সবাই জানেন রাজ্য বিজেপি কেন্দ্রীয় বিজেপির নির্দেশ মতো চলে। তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে অসাংবিধানিক ভাবে মমতা হটাও প্রোগ্রামে খুব একটা আগ্রহ রয়েছে বলে মনে হয় না। মমতাকে সরাতে রাজ্য বিজেপিদের দেওয়ালে পিঠ

> **সাগরদীঘির উপনির্বাচনে কংগ্রেসের কাছে হারকে নীতিহীন জোটের ফসল বলেছিলেন মমতা। তেমনই একটি নীতিহীন জোটে মমতা এখন নিজেই শামিল হয়েছেন।**

দিয়ে লড়ছে, তবে গত দু' বছরে মমতার বিরুদ্ধে তারা যে খুব একটা সুবিধা করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। পঞ্চায়েতের অনৈতিক ভোট তার বড়ো প্রমাণ। এটা ঠিক শাসক শত্রু আস্তিন ফোলাবেই। তা দেখে কেঁদে ফেললে অরণ্যে রোদনই হবে। বিজেপি ২৪ শতাংশ ভোট পেয়েছে আর সব বিরোধী মিলে মমতার বিরুদ্ধে প্রায় ৪১ শতাংশ ভোট হয়েছে। আমার ধারণা মমতার ৫২ শতাংশ ভোটের অন্তত ৩০ শতাংশ জল আর সন্ত্রাস কবলিত ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত ভোটে মমতা ঠিক এইভাবেই ৩৪ শতাংশ গ্রামবাঙ্গলার ভোট উদরস্থ করেছিলেন। তাই এই প্রহসনের ভোটের অঙ্কটা থেকে দূরে থাকছি। কাটা ছেঁড়া করলে মান্যতা পেয়ে যাবে।

একসময় জাতীয় কংগ্রেসকে সরাতে রাজীব গান্ধী বিরোধী এই ধরনের জোট তৈরি হয়েছিল। তারা সাফল্য পায়। তবে সেবারে কংগ্রেস বাইরে ছিল। তাই রাজ্যে মমতা বিরোধী জোটে সমস্যা একটাই। জোটে বড়ো গোঁজ কংগ্রেস। পাঁচ রাজ্যে ভোটের পর বোঝা যাবে এই রাজ্যে কংগ্রেস কতটা একা লড়তে পারবে। অধুনা অবলুপ্ত হয়ে যাওয়া বামেরাও-বা কতটা মাথা তুলতে পারবে। এরা কেউ বিজেপির সঙ্গী হবে না। ফলে 'অ্যাডভানটেজ মমতা'। সাগরদীঘির উপনির্বাচনে কংগ্রেসের কাছে হারকে নীতিহীন জোটের ফসল বলেছিলেন মমতা। তেমনই একটি নীতিহীন জোটে মমতা এখন নিজেই শামিল হয়েছেন। আমার ধারণা অনেকটা বাধ্য হয়েই এ পথ নিয়েছেন মমতা। তবে এ যাত্রা বোধহয় তাঁর মিশন আর সফল হবে না। পালাবার আর পথ নাই। যম আছে পিছে। তেমন দু'টো যমের কথা জানি। তবে আপাতত তা পরের সংখ্যাগুলির জন্য তুলে রাখলাম। আবার বলছি 'ডেডলাইন সেপ্টেম্বর।' ◻

মিড ডে মিলে যা পাচ্ছিস খা তোরা তো আর ভোটার নয়

গরিবপ্রেমিকাষু দিদি,

'অনাহারে নাহি খেদ, বেশি খেলে বাড়ে মেদ....

হীরক রাজা বুদ্ধিমান, করো সবে তার জয়গান'

না। দিদি, এমন 'না' লিখে কখনোও চিঠি শুরু করিনি আগে। আপনার অনুগত হয়েও আজ কিছু বলতে ইচ্ছা করছে। দুটি বিষয়ে। দুটিতেই আপনার গরিবদের প্রতি মমতার কথা রয়েছে। আবার আমার মনে কিছু প্রশ্নও রয়েছে। আজ একটু সাহস করে বলেই ফেলি। উপরের বিখ্যাত লাইন দুটিও অনেকে সাহস করে লিখেছি। বাংলায় কেমন যেন 'সত্যি সত্যি' মনে হচ্ছে ওই দুটো লাইন।

এই রাজ্যে স্কুল পড়ুয়াদের মিড ডে মিলের খাবার দিনে-দিনে অখাদ্যে পরিণত হচ্ছে। এটা আমার কথা নয়। পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের কথা। খাবার 'অখাদ্য', কারণ তাতে নেই পুষ্টি, নেই তৃপ্তি। তাকে কি আর 'খাদ্য' বলা যায় দিদি? মিড ডে মিলের জন্য যা সরকারি বরাদ্দ প্রাথমিক স্তরে মাথাপিছু ৫ টাকা ৪৫ পয়সা, এবং উচ্চ প্রাথমিক স্তরে ৮টাকা ১৭ পয়সা। এতে ভালো-মন্দ দেওয়া যায় না ঠিক কিন্তু ইচ্ছা থাকলে তাকে পুষ্টিকর ও সুস্বাদু কি করা যায় না? তবে আপনি ভোট ভালোবাসেন। পড়ুয়া নয়, তাদের বাবা-মায়েদের খুশি করতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে প্রতি সপ্তাহে মাথাপিছু কুড়ি টাকা বাড়তি বরাদ্দ করেছিল আপনার শিক্ষা দপ্তর। সেই টাকায় কত ডিম, মাংস, ফলমূল পরিবেশন করতে হবে স্কুলগুলিকে তার তালিকাও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেওয়া হয়েছিল কি? তবে ভোট মিটতেই সেই বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

স্কুলে কী খায় শিশুরা? জলের মতো ডাল, ঝোল বেশি। শাকসবজি কম তরকারি। এটাই মূলত। তবে মাঝে মাঝে নুনভাতও জোটে। তবে দিদি পঞ্চায়েতের আগে খাবারের মান বাড়িয়ে আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন, শিশুর মুখের খাদ্যকেও ভোটের টোপ করা যায়।

দিদি, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে অথবা সরকারি স্কুলে রান্না-করা খাবার পরিবেশন কিন্তু শিশুদের প্রতি করুণা দেখানো নয়। ২০১৩ সালে ভারতে খাদ্যের অধিকার আইন পাশ হয়েছে। আবার মিড ডে মিলের খাবার কেমন হবে, সে বিষয়ে নির্দেশ রয়েছে সুপ্রিম কোর্টেরও। ২০০১ সালের সেই নির্দেশ অনুযায়ী, রান্না-করা খাবারে প্রাথমিকের পড়ুয়াদের দৈনিক অন্তত ৩০০ ক্যালরি সম্পন্ন খাবার দিতে হবে, যার মধ্যে আট থেকে বারো গ্রাম প্রোটিন রাখতে হবে। একই সঙ্গে বলা হয়েছিল, মিড ডে মিল কোনো অনুদান নয়— অধিকার।

কিন্তু দিদি, এই বাংলায় সবাই জানে মিড ডে মিলের টাকা দিতে আপনার সরকার কী করে। আপনিও জানেন। মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ তহবিলের নাম করে কেন্দ্রের দেওয়া মিড ডে মিলের টাকা আপনি খরচ করেন। কখনো বগটুইয়ের ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য, কখনো রামপুরহাটে দুর্ঘটনায় আহতদের জন্য। কিন্তু এটা কি করা যায়? কেন্দ্রের পাঠানো এক প্রকল্পের টাকা অন্য প্রকল্পে খরচ করা যে অন্যায়। এই দুর্নীতি তো কেন্দ্র সরকার মেনে নিতে পারে না। কেন্দ্রকেও তো সাধারণের করের টাকার হিসাব দিতে হয় দিদি। আমি ভয় পাচ্ছি। আপনাদের দুর্নীতির দায়ে কেন্দ্রকে যেন শিশুদের খাদ্যের টাকা বন্ধ করে দিতে না হয়।

কেবল মিড ডে মিল নয় দিদি, উন্নয়ন তথা সামাজিক সুরক্ষার প্রায় সব প্রকল্পেরই এক হাল। সবই যেন দেখানোর জিনিস। কাজের জিনিস নয়। আপনি জোর গলায় বললেই 'খাদ্যসাথী' পুষ্টিবিধান হয়ে যায় না। 'কন্যাশ্রী' মানেই নারীশিক্ষা হয়ে যায় না। 'স্বাস্থ্যসাথী' মানেই সুচিকিৎসা হয়ে যায় না। গালভরা নাম থাকলেও প্রকল্পের রূপায়ণ হয় না। যেমন করে আপনি প্রতি বছর যে কোনো অভিনেতাকে ধরে 'মহানায়ক' উপাধি দিয়ে দিলেই তিনি উত্তম কুমার হয়ে যান না।

দিদি গো, কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াইটা বন্ধ করুন। এই তো একুশে জুলাই শহিদ দিবস অনুষ্ঠানে গিয়ে শুনলাম আপনি মঞ্চ থেকে বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকার যদি টাকা না দেয়, তবে রাজ্য সরকারই আবাস যোজনার টাকা দেবে। নবান্ন ঠিক করেছে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে অনুমোদিত ১১.৩৬ লক্ষ বাড়ি তৈরি হবে। কিন্তু পুরনো হিসাব আপনি দেবেন না ঠিক করে রেখেছেন। একই সঙ্গে জানিয়েছে, রাজ্য সরকারই বাড়ি তৈরির টাকা দেবে। প্রথমত, এটা কি আইনত সম্ভব? কেন্দ্রে প্রকল্পের টাকা কি রাজ্য দিতে পারে? আপনি কি নিজের দলের কর্মী, সমর্থক, ভোটারদের ভুল বোঝালেন? অসত্য বললেন? প্রথনে বললেন, টাকা জোগাড় করবেন। পরক্ষণেই বলে দিলেন টাকা জোগাড় হয়ে গিয়েছে। কোথা থেকে পেলেন দিদি? আপনার সরকারের ভাঁনার যে শূন্য তা তো আপনিই বলেছেন। সেই জন্যই সরকারি কর্মীদের ডিএ দিতে পারছেন না।

জানি, একটা উপায় রয়েছে। বিভিন্ন খাতের টাকা এনে দিতেই পারেন। তাতে সেই সব ক্ষেত্রের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। তবে দিদি, আরও কেটা সুবিধা রয়েছে। সেটা আপনি আর আমি জানি। যদি কেন্দ্রের টাকা না হয়, তবে কেন্দ্রীয় নজরদারিও থাকবে না।। গুছিয়ে লুট করা যাবে। □

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

মণিপুরের বীভৎস হিংসার ঘটনাগুলি বেদনাদায়ক, কিন্তু বিরোধীদের প্রতিবাদ নিতান্তই একপেশে

মণিপুরে জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র হিংসার বিস্ফোরণ ও মানুষের ওপর চরম অমর্যাদার ব্যবহার যা তাদের প্রতিবেশী নাগরিকরাই পরস্পরের ওপর নামিয়ে আনল তা স্বাভাবিকভাবেই নাকি ভারতকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। একটা সময়ে আদ্যোপান্ত অবহেলিত একটি অঞ্চল আজ এমন নজরের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে গেছে যে একে বিষয় করে সংসদ পর্যন্ত অচল হয়ে গেল। এমনকী নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পর্যন্ত আনা হয়েছে। একটা জিনিস এ থেকে প্রমাণ হলো যে ভারতের রাজনৈতিক একীকরণ আজ সম্পূর্ণ। প্রতিটি প্রান্ত একসূত্রে বাঁধা। কিন্তু বাস্তবে এটি একশো শতাংশ সত্য নয়। তা যদি হতো তাহলে পশ্চিমবঙ্গে সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনের রক্তক্ষরণ এবং ব্যাপক হিংসা ও নাগরিক অধিকার তছরূপ এতটা ধামাচাপা থাকত না। এই ঘটনার নায়করা ইউরোপের কোনো সংসদে মণিপুর নিয়ে নিন্দার খবরে অত পুলকিত হতেন না।

নিশ্চিতভাবে মণিপুরে যা ঘটেছে তা করুণ যার পুনরাবৃত্তি যেন কখনও না হয়। কিন্তু এর মধ্যে একটি সুপ্ত প্রশ্ন ও প্রচ্ছন্ন উত্তরও রয়েছে। যে নাগরিক সমাজ ও প্রচারমাধ্যম তুমুল পরিবেশনার মাধ্যমে খুনোখুনি পর্যায়টিকে মানুষের মধ্যে জাগরুক করে রেখেছে যেটি আসন্ন ২০২৪-এর মহা নির্বাচন কাছাকাছি না থাকলে হতো কিনা সন্দেহ। অন্তত তাদের এই দামামা বাজানো প্রচার চোখে পড়ত না। ইতিমধ্যেই পশ্চিমি তথাকথিত বুদ্ধিজীবী গ্যাঙের একটা অংশ প্রচারের আলোয় থাকতে ভারতকে 'অনুদার গণতন্ত্র (illiberal democracy)' আখ্যা দিয়ে 'আংশিকভাবে উদার' বলে ফতোয়া দিয়েছে। এই সূত্রে বাড়তি বল পেয়ে বিরোধীরা নরেন্দ্র মোদী যাতে তৃতীয়বার নির্বাচিত না হন তার জন্য কাছা খুলে নেমে পড়েছে। পাটনায় প্রথম মিটিং থেকে বিরোধী তারা-খচিত সভা ব্যাঙ্গালোরে হয়েছে। উদ্দেশ্য, যেভাবে হোক যদি 'কমন ফ্রন্ট' কোনোমতে খাড়া করা যায় যারা জি-২০ সম্মেলনে মোদীর দাবি মতো ভারতের নেতৃত্ব দেওয়ার গৌরবজনক অধ্যায়কে নষ্ট করে দিতে পারে।

নিশ্চিতভাবে বিরোধীরা একটি সুনিয়ন্ত্রিত চক্রান্তকারী পরিকল্পনাকে সাফল্যদানের উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এর থেকে তারা সময় সময় লাভজনক ফলও পেয়েছে, আবার প্রায়শই মুখ থুবড়ে পড়েছে। আমরা সকলেই আগামী বছরের মে মাসে ভোট গণনার দিন ভারতের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক উৎসবের উজ্জ্বল পরিসমাপ্তি দেখব। অজস্র ভারতবাসী সক্রিয়ভাবে এই ভোটপর্বে অংশগ্রহণ করবেন আর অনেকে কেবলই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে কম সক্রিয় হবেন। এবার একটি অংশ এখনও রয়ে গেছে যারা ভোটের দিনটি বাড়িতে থেকে ছুটি উদ্‌যাপন করবেন। এঁদের গণতান্ত্রিক চেতনা ও ব্যবহারিক প্রয়োগে এখনও ফাঁক রয়ে গেছে।

আজকের পরিসংখ্যান ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার সামগ্রিক প্রতিফলন বিচারে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন স্থানে ছাড়া ভোটপর্ব অবশ্যই গণতান্ত্রিক মানদণ্ডের মর্যাদা রক্ষা করে আসছে। একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে ১৯৯০ থেকে ভারতীয় নির্বাচনের সততা ও সংহতি ক্রমশ অসাধারণ হয়ে উঠেছে। এটি আজ অনেক দেশের কাছে অনুকরণীয় অবশ্যই, পরাজিত পক্ষ ফলাফলকে দীর্ঘস্থায়ী হিসেবে ধরে নিয়ে বুকচাপড়ানো, অভিসম্পাত কিছুই দিতে বাকি রাখে না।

এই ফলাফল, হেতু নির্দিষ্ট কয়েক বছরের সময়সীমা অন্তর ঘটে থাকে এবং গণতান্ত্রিক যন্ত্রপাতি (democratic hardware) ঠিকমতোই কাজ করে সেক্ষেত্রে ভারত partly free, বাকিটা illiberal বলার ভিত্তি কী? গণতন্ত্রের মূলভিত্তি অনুযায়ী দেশের

কংগ্রেসের মাথারা যাদের অতীতে তুমুল শ্লাঘা নিয়ে নিতান্ত প্রাদেশিক কুঁচোকাঁচা বলে গ্রাহ্য করত না, আজ তারাই অত্যন্ত অভ্যস্ত, নিপুণ উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেদের স্বাক্ষর রাখছে। এই ব্যাপক গুণগত পরিবর্তনকে সহ্য করতে না পারার জন্যই হতমানরা নতুন লেবেল বার করেছে 'illiberal'— অগণতান্ত্রিক।

নাগরিকদের পূর্ণ অধিকার রয়েছে একটি ক্ষমতাসীন সরকারকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ক্ষমতাচ্যুত করার। নাগরিকের এই মূল্যবান অধিকার সর্বদা ব্যবহৃত না হলেও সেই ১৯৫১-৫২ সালের প্রথম সংসদীয় নির্বাচন থেকে আজ অবধি কখনও দেশবাসী দ্বারা চ্যালেঞ্জ হয়নি। শুধু তাই নয়, ক্রমাগত ভোটার তালিকায় যথাযথ পরিবর্তন, ভোট প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তি উন্নয়নজনিত পরিমার্জন এবং সর্বোপরি বৈদ্যুতিন যন্ত্রের মাধ্যমে ভোটদান ও নির্ভুল গণনা এক বিপুল সদর্থক পরিবর্তন শুধু নয় মানুষের নিজের ভোটের ওপর আস্থাও বাড়িয়েছে। আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে বিশ্বের তথাকথিত অগ্রগণ্য গণতান্ত্রিক বলে যে দেশগুলি সবিশেষ গর্ব করে তারা আমাদের দেশের মতো নির্বাচনী পরিচালনা আদৌ সফলভাবে করতে পারবে কি না?

যথাযথ স্বাধীনতা দেশের অনেক নাগরিক ভোগ করতে পারে না— এই বিষোদ্‌গারটি মোদী সরকারের ওপর এক শ্রেণীর একচ্ছত্র ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী মানুষ করেন। তাঁরা উদাহরণ হিসেবে সোশ্যাল মিডিয়ার কর্মীদের ওপর সরকারের শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগ্রহণ এবং ১৭০০ এনজিও-র ওপর হয় বিদেশ থেকে অর্থাগমের সুযোগ বা অবস্থা বুঝে লাইসেন্সগুলিই বাতিল করে দেওয়াকে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন। এই সব সংগঠনের অনেকেই রাজনৈতিক কার্যকলাপে সক্রিয় ভাবে অংশ নিত তার খরচা আসত বিদেশ থেকে। এদের আরেক দলের মূলমন্ত্র ব্যাপক ধর্মান্তরণ। সরকারের এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার চেষ্টা করার ফলে যারা এনজিওগুলিকে সামাজিক আন্দোলন এবং অন্য উদ্দেশ্য সাধনে গোপনে ব্যবহার করতেন তাঁরা বেশ অসুবিধেয় পড়েছেন।

পাশ্চাত্য কিছু দেশের মোদী সরকারের ওপর তীব্র ঘৃণা পোষণ করার আর একটি মূল কারণ হচ্ছে আগেকার জমানায় কর্মরত বহু আমলাদেরও এই সরকারের কাজকর্মকে নিন্দিত করা। এঁদের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছেন আমলাদের অংশ-সহ, বামপন্থী মনোভাবের শিক্ষাবিদ ও মিডিয়ার এক অংশ যারা অতীতে ভোগ করা বিশেষ সুবিধে ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় অভ্যস্ত ছিল তারা এখন ছটফট করছে। পরিত্রাণ চায়।

এই ধরনের চরিত্র লক্ষণের মানুষ যে একসঙ্গে যন্ত্রণা মুক্ত হতে চাইবে তা আদৌ বিচিত্র নয়। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব গ্রহণ করার পর দিল্লিতে অবস্থিত মূলত বড়ো বড়ো সামাজিক কাজে লিপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে নজরে পড়ার মতো কর্মধারায় পরিবর্তন আসে। প্রাচীন কংগ্রেসি কার্যধারায় প্রভাবিত ব্যক্তিত্ব বা প্রতিষ্ঠানগুলি যারা বহুক্ষেত্রেই সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্রে নিজস্ব চিন্তাভাবনা প্রয়োগের সুবিধে পেতেন এবং কেন্দ্রীয় কর্ম ধাঁচাটিকে পরিচালিত করার সুযোগ পেতেন তাঁরা ধীরে ধীরে মুছে গেছেন। সে জায়গায় বিভিন্ন পটভূমি থেকে ব্যক্তিত্ব এসেছেন। যদিও এককথায় প্রকাশ করা ঠিক নয় তবে এটা ঠিক ২০১৪-র আগেকার কংগ্রেসি পরিশ্রুত নীতি নির্ধারকরা মূলত গান্ধী পরিবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এঁদের ক্রিয়াকর্ম ছিল বিচিত্র প্রক্রিয়ার যাকে প্রধানমন্ত্রী কায়দা করে 'খান মার্কেট গ্যাং' তকমা দিয়েছেন। এঁদের মূলত দিল্লিকেন্দ্রিক পটভূমির জায়গায় নরেন্দ্র মোদী সমগ্র ভারতের গ্রামীণ এলাকায় কাজ করা মাটির সঙ্গে যুক্ত বুদ্ধিদীপ্ত মানুষজনকে বিকল্প হিসেবে নিয়ে এসেছেন। এঁদের দেশ সম্পর্কে ধ্যানধারণা অনেক বাস্তবনিষ্ঠ। তাঁরা কখনই সেই ঘরানার লোক নন যাঁদের সঙ্গে প্রায়শই বিদেশি সচিবালয় বা রাজদূত অফিসের লোকজন এসে মোলাকাত করে খবরাখবর নিত বা পরামর্শও দিত। এরা ভারত সম্পর্কে দীর্ঘকাল লালিত ধারণায় দক্ষ।

গত এক দশক ধরে বিদেশে ভারত সম্পর্কে যে নব মূল্যায়ন শুরু হয়েছে সেখানে অতীতের কল্পনা থেকে ব্যাপক বিচ্যুতি ঘটেছে। পাশ্চাত্যবাসী এই নতুন নিযুক্ত সম্প্রদায়ের দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠ আদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে অসুবিধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। কংগ্রেসের মাথারা যাদের অতীতে তুমুল শ্লাঘা নিয়ে নিতান্ত প্রাদেশিক কুঁচোকাঁচা বলে গ্রাহ্য করত না, আজ তারাই অত্যন্ত অভ্যস্ত, নিপুণ উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেদের স্বাক্ষর রাখছে। এই ব্যাপক গুণগত পরিবর্তনকে সহ্য করতে না পারার জন্যই হতমানরা নতুন লেবেল বার করেছে 'illiberal'— অগণতান্ত্রিক। □

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ সহপ্রান্ত প্রচারক ধনেশ্বর মণ্ডলের মাতৃদেবী মালদহ জেলার হবিবপুর থানার অলতরা গ্রামনিবাসী ঘিনোবালা মণ্ডল গত ২৯ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত শারীরিক শিক্ষণ প্রমুখ তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বদলপুর শাখার স্বয়ংসেবক মৃণালকান্তি মণ্ডল গত ৩১ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও ২ পুত্র রেখে গেছেন। তিনি শারীরিক বর্গে দিল্লি যাওয়ার পথে গাজিয়াবাদ স্টেশনে দুর্ঘটনায় মাথায় মারাত্মক আঘাত পান। দিল্লিতে হাসপাতালে মাথায় অপারেশন করার পর কোমায় চলে যান। আর জ্ঞান ফেরেনি।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত ব্যবস্থা প্রমুখ প্রিয়ব্রত সরকারের বড়দা হাওড়া জেলার হীরাপুর শাখার স্বয়ংসেবক দেবব্রত সরকার গত ২৩ জুলাই পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৯ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র ও ২ ভাই রেখে গেছেন।

দেশের নৌ-প্রতিরক্ষায় ড্রোনের আমদানি কৃতিত্ব কলকাতার সংস্থার

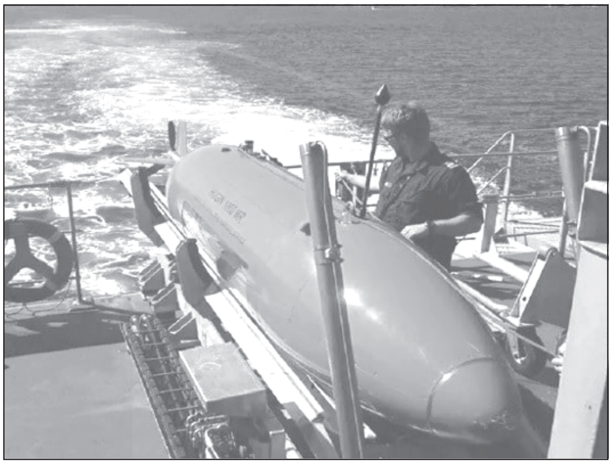

ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহ যুগান্তকারী উদ্ভাবন। বদলে যাবে জলপথে ভারতের সামরিক শক্তির চালচিত্রটাই। আধুনিক সময়ে বড়ো যে কোনো যুদ্ধেই ড্রোনের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ড্রোন একটি মানববিহীন যুদ্ধবিমান। আধুনিক অস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্র দ্বারা এটি সুসজ্জিত থাকে। এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত হানতে সক্ষম। ড্রোনের আঘাতে যুদ্ধের ট্যাংকও নিমেষে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে পারে।

কিন্তু আকাশপথে না হয়ে এই ড্রোন যদি জলপথে ব্যবহৃত হয়? জলচর ড্রোন যাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় স্বায়ত্তশাসিত জলযান বা অটোনোমাস আন্ডারওয়াটার ভেহিক্যাল বলা হয়। সম্প্রতি এটি জলের নীচে অনুসন্ধানের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। তার অন্যতম একটি কারণ হলো এগুলি মনুষ্যবাহী যানবাহনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কমদামি। বিগত বছরগুলিতে সমুদ্রে অনুসন্ধান ও নিষ্কাশনের ব্যাপারে ডুবো জলযানের ব্যবহার বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। সম্প্রতি, গবেষকরা সমুদ্রবিদ্যা এবং উপকূলীয় ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদি তথ্য সংগ্রহের জন্য এই জলচর ড্রোনের প্রযুক্তিগত উন্নতির দিকে নজর দিয়েছেন। ১৯৫৭ সালে এই জলপথের যুদ্ধযান আমেরিকায় তৈরি হয়। ১৯৭০-এর দশকে রাশিয়াও এর ব্যবহার শুরু করে। এখন পর্যন্ত বিশ্বের উন্নত দেশগুলির নৌ-সমর সজ্জিত করার ক্ষেত্রে এই অস্ত্রের ব্যবহার হচ্ছে। এবার ভারতও এর ভাগীদার হলো। সৌজন্যে, আমাদের শহর কলকাতা।

কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মন্ত্রকের সঙ্গে মিলে যৌথ উদ্যোগে জলচর ড্রোন তৈরি করল কলকাতার গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা। দেশে এই ধরনের যন্ত্র এই প্রথম তৈরি হলো। সূত্রের খবর, এই সাবমেরিন ড্রোনটি ২.১৫ মিটার লম্বা। এটি আকারে সিলিন্ডারের মতো। ব্যাস প্রায় এক ফুট। এটি জলের তলায় ৩০০ মিটার পর্যন্ত নেমে যেতে পারে। প্রায় টানা চার ঘণ্টা এই জলচর যন্ত্রটি জলের তলায় তার সক্রিয়তা বজায় রাখতে পারে। এদিকে একই জায়গাতেও বহুক্ষণ স্থির থেকেও নজরদারি চালাতেও পারে। গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং মূলত রণতরী তৈরি করে থাকে। এবার জলের তলা দিয়ে যেতে সক্ষম এই স্বয়ংক্রিয় যানবাহন তৈরি করল সংস্থাটি।

সূত্রের খবর, এই সাবমেরিন ড্রোনের নাম রাখা হয়েছে 'নীরক্ষী'। এটি জলের তলায় পুঁতে রাখা মাইন শনাক্ত করার কাজ করতে পারবে। এই যন্ত্রটির ট্রায়াল সফল হলে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়ে যাবে। ভারতীয় নৌসেনা এবং উপকূল রক্ষীবাহিনী এই স্বয়ংক্রিয় জলচর যান কিনবে কলকাতার সংস্থাটির থেকে। এমনকী সেনাও এই যন্ত্রটি কিনতে আগ্রহী।

গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিঙের চিফ কমোডোর (অবসরপ্রাপ্ত) পি আর হরি গত ২৮ জুলাই লঞ্চ করেছেন এই নীরক্ষী নামক স্বয়ংক্রিয় জলযানটি। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই জলযানটি ব্যবহার করা যাবে। মাইন শনাক্ত করতে বা বোমা জলের তলায় রেখে আসতে কাজে দেবে এই যন্ত্রটি। এছাড়া জলের তলায় সমীক্ষা চালাতে বা নজরদারি চালানোর ক্ষেত্রেও উপযোগী হবে যন্ত্রটি।

সংস্থার প্রধান জানিয়েছেন, 'এই যন্ত্রের আত্মপ্রকাশের পর বেশ ভালো সাড়া মিলেছে। নৌবাহিনী, উপকূল রক্ষীবাহিনী, এমনকী সেনাও এই যন্ত্র কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যন্ত্রটির ট্রায়াল শেষ হলে ছয় মাসের মধ্যে এই বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করে দেওয়া হবে। আশা করা যাচ্ছে, ভারতীয় নৌসেনা এবং উপকূল রক্ষীবাহিনী এই অটোমেটিক জলযান কিনবে কলকাতার সংস্থা থেকে। এর ফলে একদিকে দেশের জলপথ যেমন সুরক্ষিত হবে, বিশেষ করে মুম্বাইয়ে ২৬/১১-র পাক জঙ্গিদের জলপথে এসে হামলার স্মৃতি এখনো টাটকা রয়েছে দেশবাসীর মনে। অন্যদিকে, নৌ-সমর বলে বলীয়ান হবে দেশের সেনাবাহিনী। □

মণিপুরকে দ্বিতীয় কাশ্মীর হতে দেওয়া যাবে না

আনন্দমোহন দাস

মণিপুরের ঘটনা শুধু লজ্জাজনক একটি গণধর্ষণের ঘটনা ভাবলে ভুল হবে। দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে প্রকাশ্যে ঘোরানোর ঘটনা বুঝলে ভুল হবে। মণিপুরের সমস্যা অনেক জটিল। এটি কোনও রাজনৈতিক সমস্যা নয়। প্রকৃতপক্ষে মণিপুরের মর্মান্তিক হিংসাত্মক ঘটনায় এখন পর্যন্ত প্রায় ১২৫ জনের মৃত্যু ঘটেছে। আজকের আলোচনার প্রেক্ষাপটে হিংসার প্রকৃত কারণ জানতে হলে আমাদের মণিপুর রাজ্যের ভৌগোলিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে একটু চর্চা করা দরকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মণিপুরের ইম্ফলে জাপান ও অ্যালায়েড সেনাদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল এবং তাতে পরাজিত হয়ে বহু জাপানি সেনা মারা গিয়েছিল। সেই যুদ্ধের পর তদানীন্তন মণিপুরের রাজা বোধচন্দ্র সিংহ মহারাজ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯৫৬ সালে মণিপুর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ভারতের অঙ্গরাজ্য ছিল এবং ১৯৭২ সালে পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষ। প্রধানত মৈতেই, কুকি, নাগা উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। কিছু মুসলমান, রোহিঙ্গাও রয়েছে। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সমতল বা উপত্যকায় বৈষ্ণব হিন্দু এবং পাহাড়ে খ্রিস্টানদের আধিক্য রয়েছে।

মণিপুর হলো একটি আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী রাজ্য এবং মায়ানমার হলো পার্শ্ববর্তী দেশ। চীন ঘাড়ের কাছে নিশ্বাস ফেলছে তেল ও খনিজ সম্পদের লোভে। সেখানে প্রচুর পরিমাণে আফিংয়ের চাষ হয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকা হিসেবে এটি একটি স্পর্শকাতর রাজ্য। আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয় হলেও সুরক্ষার দিক থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মণিপুর রাজ্য মূলত দু'ভাবে বিভক্ত। একটি হলো, পাহাড়ি অঞ্চল, যেখানে মূলত কুকি, নাগা উপজাতি বাস করে এবং এরা ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। আর উপত্যকা বা সমতল ভাগে মূলত বাস করে মৈতেই সম্প্রদায়, যারা মূলত হিন্দু বৈষ্ণব এবং খ্রিস্টান না হয়ে হিন্দু ও মণিপুরি সংস্কৃতিকে রক্ষা করে চলেছে। পাহাড়ের কুকি ও নাগা সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ এবং মৈতেই সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা হলো ৫৩ শতাংশ। বাকি ৭ শতাংশ মুসলমান, রোহিঙ্গা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনবসতি রয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের অসম, ত্রিপুরা ও মণিপুর ছাড়া সবক'টি রাজ্য খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকা। এই সমস্ত দুর্গম অঞ্চলে উন্নয়নের অভাবে দরিদ্রদের মধ্যে সেবা ও শিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে খ্রিস্টান মিশনারিরা ব্রিটিশ আমল থেকেই কাজ করে চলেছেন।

তার ফলে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি, যথা, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ প্রভৃতি আজ খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই রাজ্যগুলি প্রধানত চার্চ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এবং ক্ষমতার অলিন্দে এদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। সেজন্য রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় আসতে এদের ওপর নির্ভরশীল থাকে। মণিপুর রাজ্যের পাহাড়ি এলাকায় উইলিয়াম পেটিগ্রু নামে এক ব্রিটিশ ক্যাথলিক খ্রিস্টান ১৮৯৬ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত উন্নত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের নামে ওই অঞ্চলে কাজ করতে থাকেন এবং দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে কুকি ও নাগা উপজাতিদের যিশুখ্রিস্টের নামে ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান করতে থাকেন। সেখানে তিনি প্রায় ২০০০টি চার্চ নির্মাণ করেছেন। তার ফলে পাহাড় ও উপত্যকার মানুষের মধ্যে ধর্মীয় দিক থেকে একটি বিভাজন তৈরি হয়ে যায়। স্বাভাবিক ভাবেই বিশেষ করে মৈতেই ও কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি অবিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয়। এমনকী শোনা যায়, এই রাজ্যের পুলিশের মধ্যেও জাতিগত বিভাজন বজায় রয়েছে অনেক ভাবে, কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া খুবই কঠিন কাজ। মিলিটারি দিয়ে সাময়িক আইনশৃঙ্খলার উন্নতি হলেও পারস্পরিক বিশ্বাস ফিরে না এলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি আসা অত্যন্ত কঠিন। মণিপুরে বহু দিনের আফস্পা আইনের অধিকাংশ প্রত্যাহারের ফলেও পরিস্থিতি জটিল হয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তদানীন্তন কিছু মৈতেই রাজার মাধ্যমে মায়ানমার সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গা-সহ কুকি উপজাতিদের অনুপ্রবেশের ফলে এই সমস্ত পাহাড়ি অঞ্চলের সরকারি জায়গা দখল করে বহু উপজাতি মানুষ বাস করতে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মণিপুরে কংগ্রেসের ইবোবি সিংহ সরকারের আমলে ব্যাপকভাবে আফিং চাষের জন্য ১৫,৪০০ একর জমির অনুমতি দেওয়া হয়। তার ফলে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, চীন, মায়ানমার ও নেপালকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক মাদকচক্র গড়ে ওঠে। মণিপুর আফিং ও ড্রাগের স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠে। এর ফলে মণিপুরিরা বেশি করে নেশাগ্রস্ত হয়ে যায়। এমনকী আফিং চাষিদের জায়গা বেআইনি ভাবে দখল করে উপজাতিরা বসবাস করতে থাকে। গত ফেব্রুয়ারিতে

ঘোলা জলে মাছ ধরতে খ্রিস্টান প্রভাবিত পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরামের আইজলের খ্রিস্টান নেতারা দাবি করেছেন, একমাত্র সমাধান হলো এই কুকি অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে নতুন পাহাড়ি রাজ্য গঠন করা অথবা এই সমস্ত পাহাড়ি অঞ্চলকে মিজোরামের সঙ্গে যুক্ত করা।

ফঃ ২

মণিপুর সরকার এই সমস্ত জবরদখল করা সরকারি জমি ও আফিং চাষিদের দখলীকৃত জমি উদ্ধারে এক অভিযান শুরু করে, কিন্তু কুকিদের হিংসাত্মক বিক্ষোভের ফলে মণিপুর সরকার অভিযান স্থগিত রাখে। পাহাড়ে দশজন এমএলএ-র মধ্যে অধিকাংশ শাসকদল বিজেপির থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে জনজাতি ও অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে ধীরে ধীরে সরকার বিরোধী মানসিকতা দানা বাঁধে এবং পাহাড় ও সমতলের মধ্যে বিভাজন রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এবারের জাতিদাঙ্গার মূল কারণ হলো গত মে মাসে মণিপুর হাইকোর্টের একটি রায়। মৈতেই সম্প্রদায়কে তফশিলি উপজাতি হিসেবে সরকারি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে দশ বছরের পুরোনো দাবির ভিত্তিতে মণিপুর হাইকোর্টে মৈতেই সমাজ আবেদন করে। মণিপুর ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পূর্বের এসটি স্ট্যাটাস ফিরিয়ে দিতে আবেদন জানায়।

চূড়ান্ত শুনানির পর হাইকোর্ট মৈতেই সম্প্রদায়ের আবেদনের সপক্ষে রায় দিয়ে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয় তফশিলি জনজাতি হিসেবে স্বীকৃতির জন্য ২৯ মে-র মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করতে। কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী, কোনও সম্প্রদায়কে তফশিলি জনজাতি হিসেবে সুপারিশ করার আইনগত অধিকার নাকি হাইকোর্টের নেই বলে আইন বিশেষজ্ঞরা মতামত প্রকাশ করেছেন। তারপরই এই রায়ের বিরুদ্ধে কুকি সমাজ নিজেদের জমির অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় ও বিদেশি মদতে ৩ মে পাহাড়ের সাতটি জেলায় প্রতিবাদ মিছিল বার করে। তারপর থেকে অইনশৃঙ্খলার অবনতি হয় এবং হিংসাত্মক ঘটনা চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। এর ফলে তখন প্রায় ৫৪ জনের মৃত্যু ঘটে। পুলিশের অস্ত্রাগার ও থানা থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠন করা হয়। এমনকী সীমান্তের ওপার থেকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে উগ্রপন্থীদের সাহায্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তারপর থেকেই বিভিন্ন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে চলেছে। এ ধরনের হিংসাত্মক জাতিদাঙ্গা রুখতে রুখতে অনেক আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মণিপুর সফর করেছেন এবং সেখানে পাঁচদিন থেকে শান্তি কমিটি গঠন করে বিষয়টি মিটমাট করার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কুকিরা শান্তি কমিটিতে মৈতেই সমাজের প্রতিনিধিদের নাম নিয়ে আপত্তি করায় শান্তি কমিটি কার্যকর করা যায়নি। পরবর্তীকালে দিল্লিতে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। ক্রমশ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তরোত্তর অবিশ্বাস ও সন্দেহের মনোভাগ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে ঘোলা জলে মাছ ধরতে খ্রিস্টান প্রভাবিত পার্শ্ববর্তী রাজ্য মিজোরামের আইজলের খ্রিস্টান নেতারা দাবি করেছেন, একমাত্র সমাধান হলো এই কুকি অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে নতুন পাহাড়ি রাজ্য গঠন করা অথবা এই সমস্ত পাহাড়ি অঞ্চলকে মিজোরামের সঙ্গে যুক্ত করা।

সুতরাং এই হিংসাত্মক আন্দোলনের পিছনে কাদের মদত রয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। পাশ্ববর্তী রাজ্যের এ ধরনের দাবি সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলবে। রাজনৈতিক দলগুলিও ঘোলা জলে মাছ ধরতে শুরু করেছে। এমনকী শোনা যাচ্ছে, আইজলের কিছু ইউনিয়নের হুমকিতে বেশ কিছু মৈতেই সম্প্রদায়ের মানুষ জীবন রক্ষার্থে মিজোরাম থেকে মণিপুরে পলায়ন শুরু করেছেন। সেজন্য দেশের সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের এই জটিল সমস্যার সমাধানে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত। অন্যথায় বিদেশি শক্তি এই অপ্রীতিকর অবস্থার সুযোগ নিতে পারে এবং দেশবিরোধী শক্তি এই রাজ্যে মাথাচাড়া দিয়ে বিচ্ছিন্নতার আওয়াজ তুলতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধীদের দাবি অনুযায়ী বিষয়টি নিয়ে সংসদে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হবে, তা নিয়ে বিরোধীরা দু'দিন সংসদ অচল রেখেছেন। বিজেপির মুখপাত্র জানিয়েছেন, বিরোধী দল এ বিষয়ে আলোচনার চেয়ে কোন ধারায় আলোচনা হবে, তা নিয়ে বেশি আগ্রহী।

আরেকটি বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে, ৩ মে-র ভিডিয়ো আড়াই মাস পর কেন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখা গেল? বিজেপির অভিযোগ, প্রতিটি সংসদের অধিবেশন শুরুর ঠিক আগে এ ধরনের ঘটনা সামনে আসে কেন? যেমন, হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট, মণিপুরের ঘটনা, আদানি গ্রুপের বিষয়, পেগাসাস বা রাফাল বিমান ইস্যু। এ ধরনের বিষয় নিয়ে সংসদ অচল করে রাখাই হলো বিরোধী দলের কৌশল, এমনটাই অনেকে মনে করেন।

সারাদেশে যে কোনও রাজ্যে মহিলাদের বিরুদ্ধে ওপর এ ধরনের ঘটনা অবশ্যই নিন্দনীয় এবং লজ্জাজনক, তা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, রাজস্থান, যেখানেই হোক না কেন, দলমত নির্বিশেষে সকলের একযোগে প্রতিবাদ করা উচিত। নারীশক্তির বিরুদ্ধে এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনায় অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু বিরোধী দলগুলির কেবল বিজেপি শাসিত রাজ্যের ঘটনার বিরুদ্ধে পছন্দমাফিক প্রতিবাদ অবশ্যই কাম্য নয়। বিরোধী দলগুলিকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে রাজ্য সরকারগুলিকে সাহায্য করে সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হতে হবে নতুবা এই সমস্যা, আরও জটিল আকার ধারণ করবে। সংবিধানে আইনশৃঙ্খলার বিষয়টি রাজ্যের হাতে রয়েছে। সুতরাং রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সাহায্য নিয়ে মাতৃশক্তির বিরুদ্ধে এ ধরনের অপরাধকে কড়া হাতে দমন করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্যে কংগ্রেস সরকার থাকাকালীনও এ ধরনের জাতিদাঙ্গা মণিপুরে অনেকবার সংঘটিত হয়েছে। ২০০৮ ও ২০১৪ সালেও সেখানে জাতিসংঘর্ষ দেখা গিয়েছিল। কেবল রাজনৈতিক সংঘর্ষ ও আইনশৃঙ্খলার বিষয় হলে তা দমন করা সহজ হতো। কিন্তু জাতিগত বা ধর্মীয় বিভাজনের কারণে এ ধরনের সমস্যার সমাধান করা খুবই কঠিন।

সুতরাং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের আশু প্রয়োজন হলো অবিলম্বে মণিপুরে সমস্ত জায়গায় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে উপদ্রুত এলাকায় শান্তি ফিরিয়ে আনা এবং উগ্রবাদীদের কাছ থেকে সমস্ত বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করে হিংসায় দোষীদের কঠোর সাজার ব্যবস্থা করা। রাজনৈতিক দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সমস্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে সরকারের আলোচনার মাধ্যমে মানুষের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং পারস্পরিক সন্দেহের আবহাওয়াকে দূর করে মনোবল বৃদ্ধি করতে হবে। তা না হলে কাশ্মীরের মতো মণিপুরকে দেশবিরোধী শক্তি বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবে।

(সৌজন্য : যুগশঙ্খ)

খালিস্তানি আন্দোলনের ইতিহাস এবং বর্তমান অবস্থা

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে খালিস্তানী জঙ্গিদের জমায়েত।

খালিস্তান জঙ্গিনেতা জার্নেল সিং ভিন্দ্রানওয়ালা

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

খালিস্তান আন্দোলন এক স্বাধীন শিখ মাতৃভূমি আদায়ের তথাকথিত আন্দোলন, কয়েক দশক ধরে বিশেষত কানাডায় এটা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি :

কানাডায় অভিবাসন : শিখ-সহ ভারতীয় প্রবাসীরা কানাডার বহু সাংস্কৃতিক সমাজকাঠামো গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শিখরা ১৯ শতকের শেষের দিকে এবং ২০ শতকের প্রথম দিকে বিপুল সংখ্যায় কানাডায় অভিবাসন শুরু করে। এই অভিবাসনের পিছনের প্রেরণা সেইসঙ্গে সামাজিক-রাজনৈতিক কারণগুলো শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে খালিস্তানি ভাবাবেগকে উসকে ছিল। কানাডায় শিখ সম্প্রদায় বহু বছর যাবৎ বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী এবং কানাডা দেশটার রাজনীতিতে শিখ সম্প্রদায়ের একটা বিরাট প্রভাব আছে। খালিস্তানি আন্দোলনকে বুঝতে গেলে এই পটভূমি মাথায় রাখতে হবে।

খালিস্তান আন্দোলন ১৯৭০-এর দশকে দেখা দেয় এবং ১৯৮০-র দশকে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ করে ভারতের পঞ্জাবে গতিসঞ্চার করে। খালিস্তানি আন্দোলন কানাডার অভ্যন্তরে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও আন্দোলন থেকে উদ্ভূত। বিক্ষোভ এবং সমাবেশ থেকে শুরু করে খালিস্তানের পক্ষসমর্থনকারী রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর উত্থান হয় যেমন ইন্টারন্যাশনাল শিখ ইয়ুথ ফেডারেশন (আইএসওয়াইএফ), বব্বর খালসা ইন্টারন্যাশনাল (বিকেআই) এবং এই ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করলে আন্দোলনের বৃদ্ধি এবং প্রভাবের অন্তর্নিহিত উৎস খুঁজে পাওয়া যায়।

খালিস্তান আন্দোলন কানাডা এবং ভারত উভয় দেশেই নানা বিতর্ক ও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক দুরভিসন্ধি নিয়ে বিদেশি রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে শিখদের কট্টরপন্থী, সহিংস ও সন্ত্রাসবাদী বানানোর অভিযোগ আছে। কানাডা সরকার, তাদের আইনবলবৎকারী সংস্থা ও শিখ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য এই সম্পর্কিত ঘটনাগুলো পরীক্ষা করা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সাম্প্রতিক ঘটনা : সম্প্রতি এক ঘটনায় কানাডায় শিখ সম্প্রদায় আয়োজিত প্যারেড চলাকালীন ইন্দিরা গান্ধী হত্যাকাণ্ডের উপস্থাপনা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। হত্যাকাণ্ডের একটা চিত্রিত বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত হলে তা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয় এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ঐতিহাসিক সংবেদনশীলতা ও আন্তঃধর্মীয় সম্পর্কের উপর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে উত্তপ্ত বিতর্ক উৎপন্ন হয়। এই ঘটনার মধ্যে খালিস্তান আন্দোলনকে ঘিরে চলমান উত্তেজনা ও জটিলতার অন্তর্নিহিত কারণ লুকিয়ে আছে। তবে এটা স্বল্প-মেয়াদী কারণ। মূল কারণ শিখ সম্প্রদায়ের একাংশের ভিতরে ভ্রান্ত ধর্মীয় আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে সদা তৎপর পাকিস্তান ও চীনের মতো শক্তিগুলো ভারতকে বিপদে ফেলতে চায়। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভারতে আছে বলেই তারা ব্যাপক স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি ও যথেচিত সম্মান পাচ্ছে। শিখদের পাকিস্তান থেকে নির্মম গণহত্যা ও নির্যাতনের মাধ্যমে বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং ১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত তারা পাকিস্তানে হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে লাগাতার নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

ঘটনার পর ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কানাডার কুচকাওয়াজে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের চিত্রায়ণ নিয়ে উদ্বেগ ও হতাশা প্রকাশ করে এক বিবৃতি দিয়েছেন। মন্ত্রী পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বোঝাপড়া ও ঐতিহাসিক তথ্য সংরক্ষণের ওপর জোর দেন। মন্তব্যের জেরে কানাডা সরকার কূটনৈতিক প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, এর সঙ্গে জড়িত সংবেদনশীলতাকে স্বীকৃতি দিয়ে খোলামেলা আলোচনা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে সম্মান জানানোর আহ্বান জানিয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় প্রবাসী ভারতী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোর নিষ্পত্তি করার জটিল দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

কানাডায় খালিস্তান আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে একটা অদ্যাবধি বিবরণ প্রদান করা দরকার। আন্দোলনটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকশিত হয়েছে এবং এর তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে কিন্তু তার অবশিষ্টাংশ এখনও বিদ্যমান।

১। এই বছরের মার্চে পঞ্জাবে অমৃতপাল সিংহকে গ্রেপ্তারের পর খালিস্তানি চরমপন্থীরা লন্ডনে এক সমাবেশের পোস্টার প্রকাশ করে। ১৮ জুন কানাডার সারেতে গুলিতে নিহত খালিস্তানি সন্ত্রাসী হরজিত সিংহ নিজ্জর ওরফে হরদীপ সিংহ নিজ্জার নামে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পোস্টারগুলোতে যুক্তরাজ্যে ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী এবং বার্মিংহামে কনসাল জেনারেল শশাঙ্ক বিক্রমকে হুমকি দেওয়া হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার ১৩ জুলাই ভারত দৃঢ়ভাবে লন্ডনে ভারতীয় কূটনীতিকদের কাছে যুক্তরাজ্যে চরমপন্থী গোষ্ঠী প্রেরিত হুমকির ইস্যু উত্থাপন করে জোর দিয়ে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস চেয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনস (আসিয়ান) শীর্ষ সম্মেলনের সাইডলাইনে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র সচিব জেমস ক্লিভারলির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এই আশ্বাস চাওয়া হয়েছে।

এদিকে ক্লিভারলি জয়শঙ্করের সঙ্গে এক বৈঠকে কূটনীতিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনে সরাসরি আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণীয়। আমরা দোরাইস্বামী এবং ভারত সরকারকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি যে হাই কমিশনের কর্মীদের নিরাপত্তা সর্বাগ্রগণ্য'।

বৃহস্পতিবার ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব জেমস ক্লিভারলির সঙ্গে সাক্ষাতের পর জয়শঙ্কর তার টুইটারে বলেন, 'ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব জেমস ক্লিভারলির সঙ্গে আজ এক বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সমস্যা-সহ এআরএফ-এর এজেন্ডা সম্পর্কে কথা হয়েছে। আমাদের দ্বিপাক্ষিক আদান-প্রদানের অগ্রগতির বিষয়ে যৌথভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। আমাদের কূটনীতিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ তুলে ধরেছি।'

পিটিআই রিপোর্ট অনুসারে সানফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় কনস্যুলেটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা দেখিয়ে একটি ভিডিয়ো খালিস্তান সমর্থকরা ২ জুলাই টুইটারে শেয়ার করেছে। কয়েক মাসের মধ্যে এটা ছিল দ্বিতীয় সহিংসতার ঘটনা। সানফ্রান্সিসকো এবং এর

ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকারী সতবন্ত সিং ও বিয়ন্ত সিং।

আশেপাশের ভারতীয়-আমেরিকানরা ভারতের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে সানফ্রান্সিসকোর ভারতীয় কনস্যুলেটের সামনে এই হামলার বিরুদ্ধে সমাবেশ করেছিল। বিক্ষোভকারীরা একে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বলে অভিহিত করে কর্তৃপক্ষকে অগ্নিসংযোগের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত তরণজিৎ সিংহ সান্ধু বৃহস্পতিবার সানফ্রান্সিসকোতে কনস্যুলেট পরিদর্শন করেন এবং মিশনে ভারতীয় কূটনীতিক এবং আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেন।

ভারত তার বন্ধু দেশ যেমন কানাডা, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'চরমপন্থী খালিস্তানি মতাদর্শ'কে স্থান না দিতে বলেছে কারণ এটা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য 'ভালো নয়'। কয়েক ডজন ভারতীয়-আমেরিকান সানফ্রান্সিসকোর রাস্তায় নেমেছিল, সেখানে তারা খালিস্তান সমর্থকদের দ্বারা কূটনৈতিক দপ্তরে আগুন লাগানোর পরে ভারতের প্রতি সমর্থন জানাতে ভারতীয় কনস্যুলেটের সামনে এক শান্তি সমাবেশ করেছিল। সানফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় কনস্যুলেটে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল খালিস্তানি উগ্রবাদীরা।

২। সানফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় কনস্যুলেটে আবারও ২ জুলাই খালিস্তানি চরমপন্থীদের দ্বারা আক্রমণ চালানো হয়। পাঁচ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় হামলায় চরমপন্থীরা অল্প সময়ের জন্য কমস্যুলেটে আগুন ধরিয়ে দেয়। সানফ্রান্সিসকো দমকল তৎক্ষণাৎ আগুন নেভায়। ঘটনার নিন্দা করেছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এই হামলার নিন্দা করে টুইট করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো কূটনৈতিক কেন্দ্রে হামলা ফৌজদারি অপরাধ। 'শনিবার সানফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় কনস্যুলেটে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের চেষ্টার অভিযোগের তীব্র নিন্দা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কূটনৈতিক বাসস্থান বা বিদেশি কূটনীতিকদের বিরুদ্ধে ভাঙচুর বা সহিংসতা একটি ফৌজদারি অপরাধ', তিনি টুইটারে লিখেছেন।

এর আগে ১৯ মার্চ একই ধরনের হামলায় খালিস্তানপন্থী বিক্ষোভকারীদের একটি দল সানফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় কনস্যুলেটকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এর ফলে ভারত সরকার এবং ভারতীয়- আমেরিকান সম্প্রদায় উভয়ের পক্ষ থেকে তীব্র সমালোচনা হয়। আন্দোলনকারীরা খালিস্তানপন্থী স্লোগান দিতে দিতে স্থানীয় পুলিশের অস্থায়ী নিরাপত্তা বেড়ি ভেঙে ফেলে এবং কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে দুটো খালিস্তানি পতাকা পুঁততে এগিয়ে যায়। শীঘ্রই কনস্যুলেটের দুই কর্মী পতাকাগুলো সরিয়ে নেন।

মর্মান্তিক হামলা : খালিস্তান চরমপন্থীদের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনকে নগ্ন করে দেওয়া এক বেদনাদায়ক ঘটনায় ২৩ বছর বয়সী এক ভারতীয় ছাত্রকে অস্ট্রেলিয়ায় লোহার রড নিয়ে আততায়ীরা নির্মমভাবে আক্রমণ করেছে। ঘটনাটা সিডনির পশ্চিমের শহরতলির মেরিল্যান্ডে ঘটেছে, এই চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের বিরোধিতা করার তথাকথিত দুঃসাহসের জন্য ছাত্রটিকে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল।

দ্য অস্ট্রেলিয়া টুডে নিউজ পোর্টালের প্রতিবেদন অনুসারে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রটি কাজ করতে যাচ্ছিল তখন ৪-৫ জনের একটি দল তাকে 'খালিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে তার উপর আচমকা আক্রমণ করে। ভয়ঙ্কর এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আজ ভোর সাড়ে ৫টায় যখন আমি কাজে যাচ্ছি, তখন চার-পাঁচজন খালিস্তান সমর্থক আমার ওপর হামলা চালায়'। হামলাকারীরা দ্রুত তার গাড়ির কাছে এসে জোর করে বাঁ পাশের দরজা খুলে দেয়। তার বাঁ চোখের নীচে লোহার রড দিয়ে

আঘাত করে। পুরোটা সময় তারা বারবার ‘খালিস্তান জিন্দাবাদ’ স্লোগান দিয়েছিল, এটা তাদের চরমপন্থী উদ্দেশ্যগুলোকে ব্যাপকভাবে স্পষ্ট করে তোলে’।

ছাত্রটি মারাত্মক অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে করে জানায়, ‘৫ মিনিটের মধ্যে সবকিছু ঘটেছিল এবং তারা এই বলে চলে গিয়েছিল যে খালিস্তান ইস্যুর বিরোধিতা করার জন্য তারা আমাকে এটা একটা শিক্ষা দিল। কথা না শুনলে তারা আমাকে এইরকম আরও শিক্ষা দিতে প্রস্তুত।’ নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশকে ঘটনা সম্পর্কে অবিলম্বে সতর্ক করা হয়েছিল এবং ভারতীয় ছাত্রটিকে তার মাথা, পা ও বাহুতে গুরুতর আঘাত-সহ সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্টমিড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

হামলার বর্ণনা দিতে গিয়ে পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেছেন, ‘পুলিশকে বলা হয়েছে যে ২৩ বছর বয়সী একজন রুপার্ট স্ট্রিটের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তার আগে একটি ধাতব অস্ত্রে সজ্জিত চার ব্যক্তি তাকে আক্রমণ করে।’ মুখপাত্র বলে চলেন, ‘চারজন লোক একটি ধূসর সেডানে ঘটনাস্থল ছেড়ে যাওয়ার আগে ২৩ বছর বয়সীকে লাথি, ঘুষি এবং ধাতব অস্ত্র দিয়ে বারবার আঘাত করেছিল।’ দুঃখের বিষয় এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জানুয়ারিতে মেলবোর্নে তথাকথিত ‘পঞ্জাব স্বাধীনতা গণভোট’ চলাকালীন খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং ভারতপন্থী বিক্ষোভকারীদের মধ্যে দুটো পৃথক সংঘর্ষ হয়েছে। এই ঘটনাগুলো কেবল অস্ট্রেলিয়া নয় অন্যান্য দেশের খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ রোধ করার জন্য জরুরি পদক্ষেপের তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের প্রবল অনুস্মারক হিসেবে কাজ করে।

ভারত অস্ট্রেলিয়া সরকারকে খালিস্তানি চরমপন্থীদের দ্বারা প্রচারিত ভারত বিরোধী মনোভাবের ক্রমবর্ধমান প্রবাহকে দৃঢ় মোকাবেলার জন্য আহ্বান জানিয়েছে, এই মনোভাবের ফলে সে দেশের হিন্দু উপাসনালয়গুলোতে ঘন ঘন হামলা হয়েছে। যেহেতু খালিস্তানি চরমপন্থার হুমকি ক্রমাগত বাড়ছে, বিশ্বজুড়ে সব দেশের তরফে একযোগে সহিংসতার এই ক্রমবর্ধমান স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করা অপরিহার্য হয়ে ওঠেছে। নাগরিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সর্বাগ্রে থাকা উচিত এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি ও সম্প্রীতিকে হুমকির মুখে ফেলে এমন চরমপন্থী মতাদর্শের নির্মূলকরণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ব্রিটেনে ভারতীয় হাইকমিশনে খালিস্তানিদের আক্রমণ ও জাতীয় পতাকার অবমাননা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

সিপিএম শুধু ভণ্ড নয়, এরা বর্বরও বটে

অজয় সরকার

সিপিএম মণিপুরের ধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনভাবে লিখছে যেন মণিপুরের রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই বেদনাদায়ক ধর্ষণ কাণ্ডের জন্য দায়ী। শুধু তাই নয়, এই বর্বরের দল এটাও প্রচার করছে যে মণিপুরের জাতিদাঙ্গার নেপথ্য কারণ হিন্দু-খ্রিস্টান বিরোধী।

এমন ঘটনা তো কতই হয়

প্রথমত, মণিপুরে প্রধানত তিনটি জাতিগোষ্ঠীর বাস। এরা হলো মৈতেই, কুকি ও নাগা। কুকি ও নাগারা মূলত পাহাড়ি এলাকায় থাকে এবং তা রাজ্যের মোট ভূমির ৯০ শতাংশ প্রায়। আর মৈতেইরা সমতল ভূমিতে থাকে যার আয়তন রাজ্যের মোট আয়তনের প্রায় ১০ শতাংশ।

দ্বিতীয়ত, মৈতেইরা মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ, আবার নাগা ও কুকিরা বাকি অংশ। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে মৈতেইদের অধিকাংশ বৈষ্ণব। নাগা ও কুকিদের অধিকাংশ খ্রিস্টান। এছাড়া এই তিন জনজাতিদের মধ্যে প্রায় ৮ শতাংশ মুসলমানও আছে। তবে মৈতেইদের মধ্যে যেমন কিছু খ্রিস্টান আছেন, তেমনি নাগা ও কুকিদের মধ্যেও কিছু হিন্দুধর্মাবলম্বী আছেন।

বিরোধের কারণ :

প্রথমত, ১৯৫৬ সালে নাগা এবং কুকিদের এসটি এবং মৈতেইদের এসসি বলে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে। এর ফলে, মৈতেইরা রাজ্যের ৯০ শতাংশ জমির অধিকার হারায়। কারণ, কেন্দ্রীয় আইন অনুসারে তপশিলি উপজাতিদের জমি শুধুমাত্র তপশিলি উপজাতিরাই কিনতে পারবেন, অন্যেরা নয়। এর ফলে দিনে দিনে সংখ্যাগরিষ্ঠ মৈতেইরা নিজ ভূমে সংখ্যালঘু এবং নিজভূমে পরবাসী হওয়ার আশঙ্কায় ভুগতে লাগলো। তাই দীর্ঘদিন ধরে অর্থাৎ ১৯৫৬ সাল থেকে মৈতেইরা এসটি-এর তালিকায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ করার জন্য লড়াই শুরু করে। এর মানে, মণিপুরের জনজাতি সমাজে বিভেদের বীজ নেহেরুর কংগ্রেস সুকৌশলে বপন করেছিল। এই প্রক্রিয়ার অঙ্গ হলো গৌহাটি হাইকোর্টের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ। এই পর্যবেক্ষণে হাইকোর্ট মৈতেইদের এসটি অন্তর্ভুক্তির দাবিকে মান্যতা দিয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরে কুকি প্রধান ছাত্র সংগঠন মিছিল করে। এই মিছিল সশস্ত্র এবং হিংসাত্মক ছিল। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলের নামে মৈতেইদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, খুন, লুঠ ইত্যাদি চলতে থাকে। এর প্রতিক্রিয়ায় মৈতেই অধ্যুষিত এলাকায় কুকিরা আক্রান্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, মণিপুরের আদি বাসিন্দা হলো মৈতেইরা। অন্যদিকে, কুকিরা ১৮ শতকের শেষ ভাগে মায়ানমার থেকে এসে মণিপুরে বসতি স্থাপন করা শুরু করে। মায়ানমার থেকে এসে মণিপুরে বসতি স্থাপন করার প্রক্রিয়া আজও চলছে। অর্থাৎ এই কুকিদের অবস্থা অনেকটা রোহিঙ্গাদের মতো। স্বাভাবিকভাবেই, কুকিদের জনসংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে যাওয়ার ফলে তারা আলাদা রাজ্য দাবি করছে। এতে ভূমিপুত্র মৈতেইরা শঙ্কিত।

তৃতীয়ত, বহিরাগত কুকিরা পাহাড়ি এলাকায় আফিম চাষ শুরু করে। আমরা যে 'গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেল'-এর কথা জানি, সেই গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গেলেরই অংশ হলো কুকিদের আফিম, হিরোইন, উৎপাদন এবং ব্যবসা। এতে প্রচুর অর্থ কুকিরা আয় করে কিন্তু সমাজ, বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়-এর শিকার হয়। মণিপুরের সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই আফিমচাষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। এতে কুকিরা এই সরকারের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কারণ এতে কুকিরা আর্থিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আলাদা রাজ্য হলে আন্তর্জাতিক মাদক ব্যবসায় তারা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকবে। তাই তারা তাদের

নিজেদের রাজ্যের দাবি শুরু করলো যা বর্তমান বিরোধের একটা প্রধান কারণ। ঠিক এই জায়গাতে নাগারা নিজেদের কুকিদের কাছ থেকে আলাদা করে নিল। কারণ, কুকিদের কার্যকলাপ এবং আলাদা রাজ্যের দাবি নাগাদের স্বার্থের পরিপন্থী।

চতুর্থত, এটা সত্য যে মৈতেইদের অধিকাংশ যেমন হিন্দু, তেমনি কুকিদের অধিকাংশও খ্রিস্টান। তাই একটা ন্যারেটিভ তৈরি করা হয়েছে যে মৈতেই-কুকি বিরোধের আড়ালে রয়েছে হিন্দু-খ্রিস্টান ধর্মীয় বিরোধ। এই ধরনের ন্যারেটিভ বর্বর বাম মিডিয়া এবং তথাকথিত 'লিবেরালমার্কা' মিডিয়া হাউসের অপপ্রচার। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে আজ মৈতেই-কুকি বিরোধ এবং সংঘর্ষ এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে কুকি অধ্যুষিত এলাকায় যেমন একটিও মৈতেই পরিবার খুঁজে পাওয়া যাবে না, ঠিক তেমনি মৈতেই অধ্যুষিত এলাকায় কোনো কুকি পরিবারও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ, মৈতেই অধ্যুষিত এলাকায় মৈতেই খ্রিস্টানরা যেমন নিরাপদে আছেন, ঠিক তেমনি কুকি অধ্যুষিত এলাকায় হিন্দু কুকিরা বহাল তবিয়তে আছেন। অতি সম্প্রতি 'Christian Youth's of Meitei' নামে একটি সংগঠন ঘোষণা করেছে যে মণিপুরের অশান্তির জন্য ধর্মবিশ্বাস দায়ী নয়। অথচ, বর্বর বামপন্থীরা এবং তাদের দোসর 'লিবেরাল' মিডিয়া তাদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে যে কোনো অনৈতিক কাজ অতীতে যেমন করেছে, আজও ঠিক তাই করে চলেছে।

পঞ্চমত, উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ জনজাতি অধ্যুষিত এবং এই সমাজের অধিকাংশই মাতৃতান্ত্রিক। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ধর্ষণ এবং মেয়েদের নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরানো জনজাতি সম্প্রদায়ের অকল্পনীয়, তা সে মৈতেই কুকি বা নাগা, যেই হোক না কেন। আশার আলো দেখতে পাই যখন দেখি কুকি ও মৈতেই উভয় মায়েরা নারীজাতির সম্মান রক্ষার্থে এক সুরে কথা বলছেন। ধর্ষণ কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মৈতেই সম্প্রদায়ভুক্ত। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে এবং বাকি অভিযুক্তদের বিচারের অধীনে আনার সর্বাত্মক প্রয়াস চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র সিংহ মৈতেই সম্প্রদায়ভুক্ত, অথচ, তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন যে অপরাধী যে কোনো সম্প্রদায়েরই হোক না কেন, তার শাস্তি হবেই হবে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মাতৃজাতির সম্মান রক্ষার্থে তার দৃঢ় সংকল্পের কথা জানিয়ে দিয়েছেন।

কমিউনিস্টরা শুধু ভণ্ড বা ইতরই নয়, এরা বর্বর— ভয়ংকর ধরনের বর্বর। ১৯৯০ সালে ৩০ মে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের দু'জন মহিলা অফিসার এবং UNICEF-এর একজন অফিসার, নাম অনিতা দেওয়ান ইন্সপেকশনের কাজে বানতলা রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন। সময় তখন সন্ধ্যে ৬-৩০ মিনিটের মতো। পথে সিপিএম গুন্ডারা তাদের গাড়ি আটকালো। ড্রাইভার অবনী নাইয়াকে বেঁধে রাখলো এবং মহিলা অফিসারদের টেনে হিঁচড়ে ধানক্ষেতে নিয়ে সারা রাত ধরে ধর্ষণ করলো। পরেরদিন যখন অনিতা দেওয়ানের অচৈতন্য দেহ উদ্ধার করা হলো, তখন তার যৌনাঙ্গ থেকে আস্ত টর্চ বের করা হলো। এই ধরনের বর্বরতা অসভ্যদেরকেও লজ্জা দিবে। যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তারা সিপিএমের মন্ত্রী প্রশান্ত শূরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

সিপিএম বর্বর, ওদের লজ্জা নেই। এই বানতলা কাণ্ডের সময় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন জ্যোতি বসু। এই ঘটনায় তাঁর প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 'Such incidents do happen, don't they... Mistakes do occur'। এর বাংলা হলো, 'এরকম ঘটনা তো ঘটেই, তা না— ভুল তো হয়েই থাকে।' এই বর্বরদের কোনো অধিকার নেই মণিপুরের ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করার। □

যোগ চিকিৎসা ডিপ্লোমা কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এন্ড রাজযোগ (D.A.T.H.R.Y.)

পাঠ্যসূচী ঃ- ইনট্রোডাকশন টু ইন্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ, অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুট এন্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইন্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজ (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারোপ্যাথি, রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাকটিস, স্ট্রেস (Stress) ম্যানেজমেন্ট, যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন-প্রাণায়াম-মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাজ (যোগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল : ১ বছর। ৩০ জুলাই থেকে আরম্ভ।
যোগ্যতা : ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ।
ক্লাস : প্রতি রবিবার ১টা থেকে ৪টা।

1977

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ

Regd. NGO, NITI AAYOG, New Delhi -, Govt,. of India

কোর্স ফি : ১০,০০০ টাকা। এককালীন ৮০০০ টাকা।
ইনস্টলমেন্টে প্রথমে ৫০০০ টাকা, পরের মাসে ২৫০০ টাকা করে।

ফর্ম ও প্রসপেক্টাস : ১০০ টাকা
১০১, সার্দান অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ২৯
9051721420 / 9830597884/9836522503

ভারতীয় আইন দ্ব্যর্থবোধক কেন?

সৌম্যজিৎ মাইতি

ঘটনা-১ : তখন ক্লাস টেনে পড়ি। টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। সময়টা শীতকাল। আমাদের হাইস্কুল মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হচ্ছে। টেস্ট থেকে মাইকে করে ঘোষণা করা হলো যে সমস্ত মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ওইদিন ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত আছে তাদের জন্য একটা ইভেন্ট রাখা হয়েছে (২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা); সেই ইভেন্টে চাইলে তারা নাম দিতে পারবে। আমি সেই খেলায় নাম দেব বলে টেন্টে গেলাম। নাম দেওয়ার ঘণ্টাখানেক বাদ মাইকে করে জানানো হলো— মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ইভেন্টে যেহেতু একটি মাত্র নাম জমা পড়েছে; সেহেতু ওই ইভেন্টটি বাতিল করা হলো।

ঘটনা-২ : সবে মাত্র অনার্স পাশ করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি মাসখানেক হলো। তখন আমাদের পঞ্চায়েত এলাকায় একটি হাইস্কুলে প্যারাটিচার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়। আমার একজন শুভানুধ্যায়ী আমাকে ওই পদে আবেদন করতে বলেন, ইন্টারভিউ ফেস করার জন্য যাতে ভবিষ্যতে কেরিয়ার গড়ার পথে মিনিমাম কিছু একটা অভিজ্ঞতা লাভ করি। আমি তাঁর পরামর্শ মতো আবেদন করেও দিই। মাসখানেক বাদ জানতে পারলাম ওই পদটি বাতিল হয়ে যায়, কারণ ওই পদে একমাত্র আমিই আবেদনকারী ছিলাম। আর কেউ আবেদন করেনি।

ঘটনা-৩ : ২০১৮ সালের পঞ্চায়েতের ত্রি-স্তরীয় ভোটে দেখা যায় শাসকদলের বহু প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে যাচ্ছেন বিরোধী দলের প্রার্থীদের নমিনেশন ফাইল জমা না করার বা ভীতি-সন্ত্রাস প্রদর্শন করে জমা করতে না দেওয়ার জন্য। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে যে এমনটি হয়নি তা নয়। তবে সেটা গতবারের তুলনায় কিছুটা কমেছে।

উপরের এই ৩টি ঘটনা বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায়, দেশে দু'রকম আইন বা নিয়ম চালু আছে। যেখানে কোনো প্রতিযোগিতায় আপনি নিজে অংশগ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন সেখানে আপনি একা প্রতিদ্বন্দ্বী হলে সেই প্রতিযোগিতা বাতিল। তাই আপনার ভাগ্যে শিকে আর ছিঁড়বে না। আর যেখানে শাসকদলের প্রয়োজন সেখানে আপনি একা প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও আপনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লটারি জিতে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে শাসক দল আপনাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতানোর জন্য মাঠে নেমে ভয় সন্ত্রাস-সহ নানারকম অসামাজিক কাজকর্ম করার পরিবেশ সৃষ্টি করতেও পিছপা হবে না। এই ঘটনাগুলি আমার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখা।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যে কোনো সরকার অর্থাৎ স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন থেকে সর্বোচ্চ শাসন পর্যন্ত সব ধরনের সরকার গঠিত হয় জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য। সেইজন্যই সরকার হয়ে ওঠে প্রকৃতপক্ষেই জনগণের। তাহলে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ করে পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থায় এই যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে স্থানীয় সরকার তৈরি হয় তা কী করে জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য নির্বাচিত হলো?

ভোট প্রক্রিয়া হলো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সরকার গঠনের আবশ্যিকভাবে প্রধান শর্ত। যেখানে ভোট না হয়ে স্থানীয় সরকার গঠিত হচ্ছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সেখানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আদৌ আছে তো? আর যেখানে গণতন্ত্র লুণ্ঠিত সেখানে শুধু বাক্‌স্বাধীনতাই নয়; সংবিধানে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া মৌলিক অধিকারগুলোও কীভাবে পদদলিত হচ্ছে তা গ্রাম-শহর সর্বত্র আমরা প্রতিনিয়ত চাক্ষুস করছি।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যে পঞ্চায়েতিরাজ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মতো এমন অরাজকতা চলে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থায় নির্বাচনে গণতন্ত্র লুঠ যেভাবে চলে তার খবর এবার দেশের গণ্ডি পেরিয়ে পড়শি দেশে গিয়ে আছড়ে পড়েছে। এই কাজ শাসক দল তার প্রশাসনিক যন্ত্রগুলোকে ব্যবহার করে যেভাবে নির্লজ্জের মতো স্থানীয় সরকার গড়ে তা শুধু নিন্দনীয়ই নয়; গণতন্ত্র বজায় রাখার পক্ষে অতি বিপজ্জনক। এই প্রবণতা পশ্চিমবঙ্গে আজকের নয়, বলতে গেলে বাম আমল থেকেই।

আমাদের দেশে সংবিধান প্রয়োগের সময় অর্থাৎ ১৯৫০ সালে যেহেতু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কী সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোনো জ্ঞান ছিল না এবং শিক্ষার হারও ছিল সেসময় হতাশাব্যঞ্জক ছিল, সেহেতু সংবিধান প্রণেতারা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়কে সংবিধান সম্মত হিসেবেই উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু আজ আমরা সংবিধান প্রণয়নের ৭৩ বছর পেরিয়ে এসেছি। এখনো যে ওই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় মেনে নিতে হয় বা হচ্ছে তা গণতন্ত্রের পক্ষে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সেরকম হলে সংবিধানে একটা সংশোধনী এনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের বিষয়টি উঠিয়ে দেওয়া যায় কিনা তা নিয়ে সংসদের আইনসভায় বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সুষ্ঠু গণতন্ত্রে রক্তপাত হয় কী করে? আর এই রক্তপাত নিয়ে বিরোধী দলের রাজনীতিও বলার মতো নয়। ভোটের পর মৃত্যু মিছিলও এই রাজ্যে ক্রমবর্ধমান। অথচ কোনো দলই বিশেষ করে বিরোধী দলগুলিও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কীভাবে এখনো কোনো প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করতে পারে সে বিষয়ে সংসদে বা বিধানসভায় উচ্চ বাচ্য করেন না। কারণ তারাও যে লোকসভা বা বিধানসভায় ক্ষমতায় এলে হয়তো স্বায়ত্ত শাসনে বা পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের সুযোগ নেবেন না তাই-বা কে হলপ করে বলতে পারে! সেজন্যই এই রাজ্যে পঞ্চায়েতিরাজ- ব্যবস্থায় ভোট দান প্রক্রিয়া বন্ধ করে প্রশাসক বসিয়ে দেওয়া উচিত। যে দল বিধানসভায় ক্ষমতায় থাকবে সেই দলই এই প্রশাসকের মাধ্যমে পঞ্চায়েতিরাজ পরিচালনা করবে। তা না হলে পঞ্চায়েতিরাজ বা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনে ভোটদান ব্যবস্থায় যেভাবে রক্তপাত বা মৃত্যুমিছিলের লাইন বাড়ছে তার শেষ কোথায় বা কবে হবে কেউ কি তা বলতে পারবেন? এই পদ্ধতি অর্থাৎ প্রশাসক বসিয়ে পৌরশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলেই মনে হয়। সেক্ষেত্রে রক্তপাত বা প্রাণহানির শঙ্কা একদমই কমে যাবে। □

মালদহের নারী নির্যাতনের ঘটনা বর্বরতা

সত্যি পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে কোনো নারী নিরাপদ নয়। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী কীভাবে এতো অসংবেদনশীল হতে পারেন তা ভাবতেই পারা যায় না। হাড়হিম করা ঘটনা। গত মঙ্গলবার দুজন আদিবাসী সমাজের মহিলা হাটে যান। সেখানেই তাদেরকে কয়েকজন মহিলা দলগত ভাবে ভীষণ প্রহার করে। প্রকাশ্য দিবালোকে হাটের মধ্যে সর্বসমক্ষে মারতে মারতে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে দেয়। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহ জেলায় বামনগোলা থানা অন্তর্গত পাকুয়াহাটে। ভাবতে অবাক লাগে পাকুয়াহাট ফাঁড়ির পুলিশ এই দুজনকেই আটক করে। এই অমানবিক কাজ এক গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসেবে প্রতিবাদ না করে থাকতে পরছি না। ভাবছি এই জন্যই কি দেশের হাজার হাজার তরুণের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা অঅমরা লাভ করেছি? এটাও আমাদের দেখতে হলো?

একদল দুস্কৃতী যাই অপরাধ করুক না কেন দেশে তো আইন আছে। সংবিধান আমাদের মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার দিয়েছে। যারা এই অধিকার হরণ করলো, যারা আইন নিয়ে খেলা করলো মমতার পুলিশ তাদেরকেই বাঁচাতে কাজে লেগে পড়েছে। কেন এমন হবে? পুলিশ তো পাবলিক সার্ভেন্ট। বাংলায় যাকে বলা হয় জনগণের চাকর। দেশের গরিব মানুষরা দুবেলা ঠিক মতো খেতে না পেলেও তাদের অপ্রত্যক্ষ করেই পুষ্টি লাভ করে এই পুলিশরাই। তবে সেই পুলিশের কাছে কেন কোনো সহযোগিতা পেল না ওই জনজাতি সমাজের দুই মহিলা? উলটে পুলিশ তাদের আটক করলো। এতো দেখছি, 'এক যে আছে মজার দেশ' কবিতার মতো। সত্যি এবার পশ্চিমবঙ্গের আকাশ সবুজ হবে। আর গাছের পাতা হবে নীল।

পুলিশের উচিত ছিল নির্যাতিত মহিলা দুজনকে প্রথমেই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। মেডিকেল পরীক্ষা করা। তাদের কাউন্সেলিং করা। বয়ান রেকর্ড করা। রাজ্য পুলিশ কি করলো? এই সব আইনগত কাজ না করে ওদের আটক করলো। শোনা যাচ্ছে ওদের নামে বামনগোলা থানায় চুরির অভিযোগ আছে। যদি তাই থেকে থাকে তাহলে কেন তাদের আগে গ্রেপ্তার করা হয়নি? ওরাতো লুকিয়ে ছিল না? আসলে রাজ্য সরকার ও পুলিশ চায়নি সংবাদ মাধ্যম যেন ওদের ধরতে না পারে। সংবাদমাধ্যম জানলেই ঘটনা সারা দেশে রাষ্ট্র হয়ে যাবে। এই হাড়হিম করা ঘটনা সারা দেশ জানবে, এটা চায়নি মমতা। তাই আটক। আর যতো দেরি করে মেডিকেল হবে, ততই প্রমাণ লোপ পাবে। সিপিএমকে তাড়িয়ে যেদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন সেদিন মানুষ খুশি ছিল। আজ সেই মানুষ মমতার বিদায় চাইছে। চুরি করে ভোট পাওয়া আর ডিম-ভাত খাইয়ে সরকারি উদ্যোগে লোক জড়ো করে তার অবক্ষয় আর কিছুতেই আটকানো যাবে না।

—দীপা হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস

রাজ্য সরকারের তীব্র আপত্তি অগ্রাহ্য করে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস গত ২০ জুন রাজভবনে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদ্‌যাপন করেছেন। খবরে প্রকাশ, ওই ঘটনা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— প্রদেশ বিভাজনের ঘটনা বাঙ্গলা মনে রেখেছে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান হিসেবে; 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করে রাজ্যপাল বাঙ্গলাকে, বাঙ্গলার মাটি ও মানুষকে অপমান করেছেন। কিন্তু ইতিহাস কী তা বলছে? ইতিহাস বলে— ২২ এপ্রিল, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নয়াদিল্লিতে যে জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সেখানে ঐতিহাসিক ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন বাঙ্গলা বিভাজনের সমর্থনে ভাষণ দিয়েছিলেন। ৭ মে একটি তারবার্তায় স্যার যদুনাথ সরকার প্রমুখ বাঙ্গলার পাঁচজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ভারত সচিব লর্ড লিস্টওয়েলকে বলেছিলেন— '...We strongly support the immediate formation of a separate West Bengal Province guaranteeing.../শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর ২৪.৬.১৯৫৩ সালে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি, আইনজীবী ও কর্মচারীদের সমবেত শোকসভায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রয়াত ফণীভূষণ চক্রবর্তী বলেছিলেন— বাঙ্গলা ভাগ হয়েছিল বলেই হাইকোর্ট আজ কলকাতার বুকে রয়ে গিয়েছে। সারা বাঙ্গলার সংবাদমাধ্যম এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের প্রায় একশত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাঙ্গলাভাগের সমর্থনে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকার সমীক্ষায় বাঙ্গলা ভাগের পক্ষে শতকরা ৯৭ জনের সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল— ('শ্যামাপ্রসাদ : বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ'— ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ; পৃ. ৩০৪-৪০৫; ৩২১-৩২২; ৩১৭-৩২০)। অবিভক্ত বাঙ্গলার আইন সভায় হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন মাত্র একজন, স্বয়ং শ্যামাপ্রসাদ। তাই তিনি আইন সভার কংগ্রেসী হিন্দু সদস্যদের আহ্বান জানিয়েছিলেন; কারণ তারা সবাই হিন্দু ভোটে নির্বাচিত বাঙ্গালির ওই দুর্দিনে তিনি কংগ্রেসীদের আত্মরক্ষার পথনির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তার ফল ফলতেও বিলম্ব হয়নি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন অবিভক্ত বঙ্গীয় আইন সভায় বাঙ্গলাভাগের প্রস্তাব ১২৬-৯০ ভোটে গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, যারা জিগির তুলেছিল— 'পাকিস্তান দিতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে', সেই কমিউনিস্ট পার্টির জ্যোতি বসু-সহ তিন সদস্যও বাঙ্গলাভাগের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন— (ঐ, পৃ. ২৮২, ৩২১, ১৩৮; ও 'বঙ্গসংহার এবং'— সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত; পৃ. ৪৮)।

আমরা যাকে 'পশ্চিমবঙ্গ' বলে এসেছি তা বস্তুত অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশের পশ্চিম ভূখণ্ড ছিল। তাই জওহরলাল নেহরু কিরণ শঙ্কর রায়কে লেখা পত্রে (১৭.৫.৪৭) 'ওয়েস্টার্ন' কথাটি ('...then there must be a partition of Bengal and western Bengal must join the Union...'— ('বঙ্গসংহার এবং'— পৃ. ৩৮) কথাটি লিখেছিলেন। অবিভক্ত বাঙ্গলার পশ্চিম ভূখণ্ড নিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে 'পশ্চিমবঙ্গ' রাজ্য গঠিত হয়েছে। তার আগে পশ্চিমবঙ্গ বলে কোনো

ফঃ ৩

রাজ্য ছিল না। 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদযাপন করে রাজ্যপাল ওই ঐতিহাসিক ঘটনার যথোচিত স্মৃতিচারণা করেছেন। একথা ঠিক এতকাল আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কথা শুনিনি। কারণ সহজবোধ্য। পশ্চিমবঙ্গ হিন্দু মহাসভার সভাপতি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে আমরা একজন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি বলে প্রচার করতে অভ্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত বলতে উঠলে বক্তাকে শ্যামাপ্রসাদের অবদানের কথা বলতে হবে এবং কেন, কি কারণে সর্দার প্যাটেল কেন্দ্রীয় আইন সভার কংগ্রেস সদস্য ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীকে লিখেছিলেন (তাং-১৩.৫.১৯৪৭)— '...The only way to save the Hindus of Bengal is to insist on Partition of Bengal', সে সমস্ত কথাও বলতে হবে। আমাদের 'সেকুলার' নেতা-নেত্রী বা একই মানসিকতার বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে সেসব বলা সম্ভব? তোবা তোবা!

—**বিমলেন্দু ঘোষ,**
কলকাতা-৬০।

মণিপুরে জনজাতি সমস্যা

মণিপুর নিয়ে সবাই চিন্তিত। আসল সত্যটা অনেকেই জানেন না। ওখানকার জনজাতি মৈতেই সমাজকে ওখানকার রাজা ভালো চোখে দেখতেন না। তাই তিনি তার সৈন্য বাহিনীতে প্রতিবেশী মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গাদের ও ওখানকার কুকিদের নিয়োগ করেন। তারাই মিলিত ভাবে জনজাতি মৈতেই সমাজের মানুষের উপর অত্যাচার চালাতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রোহিঙ্গারা ওখানে বসবাস শুরু করে। খ্রিস্টান মিশনারী ও কুকি সম্প্রদায় মিলে মৈতেই সমাজের মানুষদের ধর্মান্তরিত করা শুরু করে। চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি হয় সেখান থেকে। মৈতেই সমাজের জীবিকা কৃষিকার্য। ১৯৮১ সালে দুই সম্প্রদায়ের দাঙ্গা হয়। ইন্দিরা গান্ধী রোহিঙ্গা ও কুকিদের পাহাড়ের উপরে ও মৈতেইদের সমতলে থাকতে বলে। কুকিরা উপরে থাকায় সমতলের মৈতেইদের আক্রমণে সুবিধা পেত। এছাড়া কুকি ও রোহিঙ্গারা আফিম চাষ করে প্রচুর লাভ করায় মৈতেইরা আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়ে। এই অসন্তোষে ২০০৮ সালে ফের দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এবার সোনিয়া গান্ধীর কথা মতো এক প্রকার আফিম চাষকে বৈধ করে দেয়। পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিত না। বিগত ৭০ বছর কংগ্রেস এই ভাবে জোড়া তালি দিয়ে সরকার চালিয়েছে। দিল্লি থেকে ঠিক মতো নজর দেওয়া হয়নি।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী সরকার সারা ভারতের সঙ্গে মণিপুরের দিকে নজর দেয়। আফিম চাষ অবৈধ ঘোষণা করে। এতেই কুকি ও রোহিঙ্গারা হিংস্র হয়ে ওঠে। শুরু হয় জাতি দাঙ্গা। এদের সঙ্গে যোগ দেয় ড্রাগ মাফিয়ারা। তাদের সাম্রাজ্যে আঘাত লেগেছে যে। এদের সঙ্গে মিশে যায় নাগারা। বীরেন্দ্র সিংহ কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেয়। বিজেপি সরকার গড়ে। নাগা, কুকি ও রোহিঙ্গারা হিন্দুদের বাড়িঘর দোকানপাট জ্বালিয়ে দেয়। ভয়ে লোকজন পালাতে শুরু করে। ওদের চাপে মৈতেই সমাজের সিডিউল কাস্টের অধিকার তুলে নেওয়া হয়। তা কুকিদের দেওয়া হলে আরও গণ্ডগোল বাড়ে। পরে কোর্টের আদেশে তা আবার মৈতেইদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আক্রোশে মানুষ যে জন্তুতে পরিণত হয় তা নারী নির্যাতনে প্রমাণিত। এর সঙ্গে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং উসকানি রয়েছে। বিজেপির সরকার রয়েছে এটা অনেকেরই অস্বস্তির কারণ। তাই চলুক রাজনীতি।

—**শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

অহি নকুলের জোট

আগামী দিনের জোট সাফল্য এই এলো বলে। অহি নকুলের সার্থক মেলবন্ধনে আজ সত্যিই আমরা গর্বিত, পুলকিত। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পার করে, কবি নজরুলের সুরে সুর তুলে অহি নকুলেরা এখন একযোগে কেবলই জোট বার্তা দিচ্ছে— আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি/আমি ধূমকেতু জ্বালা বিষধর কাল ফণী/আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী/আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি। কারণ এরা বংশবাদবিরোধী, প্রকৃত জাতীয়তাবাদী এবং গণতন্ত্রে যে গভীর আস্থাশীল, সেটা দেশে হোক কিংবা বাইরে, সেটা এসব প্রতীক চিহ্ন দেখে সহজেই বোঝা যায়। তার জন্য দিব্যজ্ঞান নয়, কাণ্ডজ্ঞানই যথেষ্ট, যথেষ্ট নিজেদের এবং বাপঠাকুরদার রেখে যাওয়া জ্বলন্ত অতীত এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। সবচেয়ে বড়ো কথা এবং অবশ্যই শোনা কথা, তাঁদের মধ্যে কেউই নাকি কোনোদিনও সুইস ব্যাংকে কিংবা বিদেশি ব্যাংকের ছায়া পর্যন্ত মারাননি। কথায় কথায় তাঁরা একদিকে যেমন অগণতান্ত্রিক, পুঁজিবাদী দেশ আমেরিকা, জার্মান, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ফ্রান্সের মতো দেশের গুষ্টির তুষ্টি করেন, মিটিং মিছিলে কেবলই তুলোধুনা করেন, তেমনি পাশাপাশি প্রিয় এবং আদর্শ দেশ হিসেবে তুলে ধরেন চীন, আফগানিস্তান, সুদান, পাকিস্তান, ইরাক, ইরান, সিরিয়া, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, এসব দেশকে। সকল মানুষের আদর্শ দেশ হিসেবে এসব দেশের গুণকীর্তন করেন। কেবল বুঝি না, স্বাস্থ্য কিংবা শিক্ষা পরিষেবা পেতে অথবা আপন সন্তানদের বিয়ে থা দিতে তাঁরা কেন যান না তাদের এইসব প্রিয় দেশে? তবু ভারতবাসী হিসেবে ভোট যুদ্ধকালে আমরা পুলকিত, ধন্য হই তাঁদের ভাষণ শুনে।

তাইতো বলি, সার্থক জনম আমার, জন্মেছি মধ্যযুগীয় চিন্তাধারায় এখনো টইটুম্বুর এক আজব দেশে। কাজেই তৃতীয় বিশ্বের এই দেশে, তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ হোক। এখন আর সভ্য ইংরেজদের পুনরায় দেশে ফিরিয়ে সুশাসন আনা সম্ভব নয়, কাজেই স্লোগান উঠুক, কংগ্রেস মুক্ত ভারত নয়, চাই রাজনীতি মুক্ত ভারত। রক্তপাত, হত্যা, হানাহানি, প্রান্তিক মানুষদের জীবন্মৃত রেখে আর সস্তা রাজনীতি নয়, চাই বিকল্প পথের সন্ধান। তৈরি হোক এরকম এক জোট। মণিপুর, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গের মতো আরও অনেক রাজ্য তো সেই শিক্ষাই দেয় যা বহু আগে জর্জ বার্নার্ড শ' বলে গেছেন— 'Politics is the last RESORT (আশ্রয়) of the Scoundrels.' (Add : Narayan Sankar Das, Retd. Asst. Teacher, Sonapurhat M.G. High School. Vill. Sonapurhat, Po. Chopra. Dist : Uttar Dinajpur. Mob. 9734280386. E Mail : nsdas1960@gmail.com)

—**নারায়ণশঙ্কর দাশ,**
সোনাপুরহাট, উত্তর দিনাজপুর।

প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে মায়েরা পথ দেখাতে পারেন

সুতপা বসাক ভড়

ভারতে পরিবেশের জন্য একটি বিষম সমস্যা হলো পলিথিন ও প্লাস্টিক। হিমাচল প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে পলিথিনের ওপর প্রতিবন্ধকতা লাগু হওয়ার পর, গত জুলাই মাস থেকে একবার মাত্র ব্যবহার্য প্লাস্টিক উৎপাদনের ওপরেও দেশব্যাপী বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। ১৯১১ সাল থেকেই পলিথিন ব্যাগের যথেচ্ছ ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা লাগু করা হয়। তখন থেকে একবার মাত্র ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য তিনটি রাষ্ট্রীয় আইন ছাড়াও অনেক রাজ্যে আইনের মাধ্যমে ওইসব প্লাস্টিক উৎপাদনের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। একবার মাত্র ব্যবহার করার পর ফেলে দেওয়া হয়; যেমন— প্লাস্টিকের কাপ, প্লেট, গ্লাস, কাঁটা-চামচ, ছুরি, ট্রে ইত্যাদি। 'মাল্টি লেয়ার্ড প্যাকেজিং'-এর ওপর প্রতিবন্ধ হয়নি। এগুলির ব্যবহার চিপ্‌স, গুটখা পাউচ, পানমশলা ইত্যাদিতে ব্যাপক হারে হয়ে থাকে। এইসব প্লাস্টিকের প্যাকেজিংকে ধীরে ধীরে বন্ধ করার জন্য নির্মাতাদের কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে দু' বছরের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অনেক প্রয়াস সত্ত্বেও গত দু'দশক ধরে এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করেনি। আমরা পলিথিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি, কিন্তু বন্ধ করতে অসমর্থ হয়েছি। কয়েকবছর আগেই প্রধানমন্ত্রী একবার মাত্র ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধ করার জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন। এর ফলে দেশবাসী সতর্ক হয়েছেন এবং ধীরে ধীরে তার ব্যবহার কম করেছেন।

আপাতদৃষ্টিতে সামান্য হলেও ওই পলিথিন এবং প্লাস্টিক আমাদের পরিবেশকে দূষিত ও বিষাক্ত করে তুলছে। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা সবই এর বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত। এগুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না। দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশে থেকে নানাভাবে দূষণ করতে থাকে। এগুলি জ্বালালে এমন সব বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয়, যার ফলে প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে। জলচক্রে বাধা দিয়ে বৃষ্টিপাত প্রভাবিত করতে পারে, নদ-নদীর জলস্রোত প্রভাবিত করে, কৃষিক্ষেত্রের উর্বরতা হ্রাস করে ইত্যাদি। পশুদের পেটে জমতে জমতে তারা কষ্টকর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। খাদ্যপদার্থের মাধ্যমে আমাদের রক্তেও পৌঁছাতে শুরু করেছে। পরিবেশবিদদের মতে একজন ভারতীয় প্রতিবছর গড়ে প্রায় ১০ কিলো প্লাস্টিক ব্যবহার করে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে প্রতিবছর প্রায় ৩৫ লক্ষ টন ঘরোয়া প্লাস্টিক আবর্জনা হয়। প্রত্যেক শহর ও শহরতলিতে প্রচুর পরিমাণে প্লাস্টিক আবর্জনা জমছে। লক্ষ লক্ষ টন প্লাস্টিক আবর্জনা খালি জায়গায় ফেলা হয়ে থাকে। সেখানে, সেগুলো ছোটো ছোটো মাইক্রোপ্লাস্টিকে বিঘটিত হয়ে শাকসবজি এবং অন্যান্য খাদ্যান্নের মাধ্যমে আমাদের খাদ্য-শৃঙ্খলাতে প্রবেশ করে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, আমাদের শরীরে প্রত্যেকদিন প্লাস্টিক প্রবেশ করছে, যা একটি ভয়ংকর বিষাক্ত রসায়ন। আমরা অনেক সময় প্লাস্টিকের বাসনে খাবার খাই, এটি ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

পানীয়তে প্লাস্টিকের পাইপের ব্যবহার বা মিষ্টির বাক্সের ভেতরে পাতলা পলিথিনের স্তর, ছোটোদের বই-খাতার মলাটে ইত্যাদিতে যথেচ্ছভাবে প্লাস্টিক-পলিথিনের ব্যবহার চলছে। যেমন আমরা প্লাস্টিকের ক্লিপ, চিরুণি, রান্নাঘরের টুকি-টাকি জিনিসপত্র কেনাকাটা এবং ব্যবহার কম করতে পারি। বাজারে যাওয়ার সময় নিজেদের ব্যাগে জিনিস নিতে পারি। এর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক দশক আগে পর্যন্ত আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের জীবনযাত্রা থেকে কিছু শিখতে পারি। তাঁরা তো আমাদের জন্য একটি সুন্দর পৃথিবী দিয়েছেন, আমরা মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে তাতে বিষাক্ত জিনিস ছড়িয়ে চলেছি! আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কী রেখে যাচ্ছি! প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ কেবলমাত্র সরকারি আইন করে সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত চেতনা। এই চেতনা জাগানোর জন্য আমরা আবার আমাদের মায়েদের শরণাপন্ন, কারণ সংসারের বেশিরভাগ কেনাকাটা ও ব্যবহার তাঁরাই স্থির করেন। মাইক্রোওয়েভ প্লাস্টিকের বাসনের ব্যবহার বন্ধ করা যায়। বাইরে বেড়াতে যাওয়ার সময় নিজেদের সামান্য বাসন; যেমন— ছোটো থালা, গ্লাস-চামচ নিয়ে বেরোনো যায়, এগুলো সহজেই ধুয়ে নেওয়া যায়। গাছের জন্য প্লাস্টিকের টবের পরিবর্তে মাটির টব ব্যবহারে পারি। এইরকম অনেক উপায় আছে, যার মাধ্যমে আমরা পরিবেশ সচেতন হতে পারি। এক্ষেত্রে মাতৃশক্তির দায়িত্ব অনেক বেশি, কারণ মহিলারাই হলেন—

রাষ্ট্রস্য সুদৃঢ়া শক্তি সমাঞ্জস্য চ ধারিণী।
ভারতে সংস্কৃতে নারী, মাতা নারায়ণী সদা।

অস্ত্রোপচার ছাড়াও পাইলসের নানা উপযোগী চিকিৎসা আছে

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

মলাশয়ের রোগগুলো হলো : অ্যানাল ফিসার, পাইলস্, রেকটাল পলিপ, রেকটাল ক্যানসার, আইবিএস, পাইলোনিডাল- সাইনাস, অ্যানাল আবসেস, ফিস্চুলা, রেকটাল প্রোলাপস, অ্যানাল ওয়ার্ট ইত্যাদি। এই রোগগুলোর মধ্যে সাধারণত রোগীরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন পাইলস্ রোগে। পাইলস্ রোগটির কিছু বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা রয়েছে এবং নিয়ম অনুসরণ করে রোগটির যথাযথ চিকিৎসা করলে সহজেই পাইলস্ নিরাময় হয়। দীর্ঘদিন ধরে বাসা বেঁধে থাকা পাইলস্ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে চিকিৎসা নিলে সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব। সর্বনাশটা হয় হাতুড়ে এবং অপচিকিৎসার মাধ্যমে পাইল্স রোগটির জটিলতা আরও বেড়ে যায়।

পাইলস্ হলে বা হয়ে গেলে বেশি চিন্তার প্রয়োজন নেই। সাধারণত মলাশয়ের একটি সাধারণ রোগ হলো পাইলস্ রোগ। এই রোগটি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে এবং এর ধরনও আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। উপসর্গটি অনুযায়ী শতকরা ৯০ ভাগ পাইলসের রোগী সার্জারি ছাড়াই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে ভালো হয়ে যান।

জটিলতা হয় পাইলসের রোগীদের নিয়ে অপচিকিৎসায়। তাই যতটুকু পারা যায়, সচেতন থাকার চেষ্টা করতে হয়, যাতে রোগীরা শুরুতে সঠিক চিকিৎসা করে ভালো থাকেন। সাধারণত যে পাইলসগুলো ভেতরে থাকে তা হলো : ইন্টারনাল পাইলস্। আর যে পাইলস থাকে বাইরের দিকে, তা হলো এক্সটারনাল পাইলস্ বা এক্সটারনাল হেমরয়েড। এই রোগের উপসর্গ হচ্ছে মলত্যাগের পর রক্ত যাবে এবং রক্ত যাওয়ার সঙ্গে সাধারণত কোনও ব্যথা হয় না। অনেক সময় বেশি রক্তও যায়।

পাইলস যদি প্রথম ধাপে হয়, সেক্ষেত্রে মলদ্বারে বাড়তি মাংসের মতো কোনও কিছুই থাকে না। শুধু মলত্যাগের পর তাজা রক্ত যায়। আর যদি দ্বিতীয় গ্রেডের হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে মলত্যাগের পর তাজা রক্ত যায়, সাধারণত ব্যথা হয় না এবং মলত্যাগের পর মনে হয়, ভেতর থেকে কী যেন বাইরের দিকে বের হয়ে আসে এবং সেটি এমনিতেই ভেতরে ঢুকে যায়। কারও যদি তৃতীয় ধাপের পাইলস হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে মলত্যাগের পর বাড়তি মাংসের মতো বের হয়, আগে এমনিতেই ঢুকে যেতো বা এখন চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হয়।

যদি চতুর্থ ধাপের পাইলস হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আগে মলত্যাগের পর বাড়তি যে মাংসটি বের হতো সেটি এমনিতেই ঢুকে যেত, এখন আর ঢুকছে না, এরকম সমস্যা নিয়ে অনেক রোগী চিকিৎসা নিতে আসেন। অনেক সময় পাইলসের ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে, এতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। একে বলা হয় থ্রম্বোসড্ পাইলস্। পাইলসের চিকিৎসা তার ধরনের বা উপসর্গের ওপর নির্ভর করে এবং সার্জারি করতে হবে কি-না তা পরীক্ষা করে চিকিৎসকরা নির্ধারণ করে থাকেন।

যদি প্রথম ধাপের পাইলস্ হয়ে থাকে এবং রোগীরা শুরুতেই চিকিৎসকের কাছে আসেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনও অপারেশনের প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের রোগীকে ওষুধ দেওয়া হয় এবং পায়খানা স্বাভাবিক করার জন্য নরম খাবার-সহ প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি, জল পান করতে হবে। যদি কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে, তাহলে মল নরম করার জন্য চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবন করতে হয়।

সাধারণত প্রথম ধাপের পাইলস্ শুধু অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে প্রায় ৯০ শতাংশ রোগী ভালো হয়ে যান। যদি ওষুধে কাজ না হয়, তখন বিনা অপারেশনের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায়।

পাইলসের রোগ নিরাময় ও ব্যথা কমানোর জন্য সর্বপ্রথম দরকার কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যার সমাধান করা। তার জন্য সর্বাগ্রে নজর দিতে হবে ডায়েটের উপরে। শাকসবজি, ভেষজ খাবার, ফলমূল, সেরিয়াল ইত্যাদি যদি পর্যাপ্ত পরিমানে প্রাত্যহিক ডায়েটে রাখেন, তাহলে মল নরম হয় ও এর ফলে পুরো বাওয়েল সিস্টেমও ঠিকঠাক থাকে। এতে পাইলসের জন্য পায়ু পথে হওয়া জ্বালাপোড়া ও ব্যথাও কমে।

পাইলসের ব্যথা কমাতে আরও একটি উপকারী পানীয় ঘোল। দিনে দুবার দইয়ের ঘোলে নুন, আদা ও গোলমরিচ মিশিয়ে ঘোল করে পান করুন। এছাড়া করলার সরবত ঘোলের সঙ্গে মিশিয়েও খেতে পারেন।

পাইলসে রক্তক্ষরণ ব্যাপারটা যেমন অস্বস্তির তেমনই বেদনাদায়ক। এর থেকে মুক্তি পেতে আধ কাপ ছাগলের দুধের সঙ্গে এক চা চামচ সরষের বীজ মিশিয়ে খেতে পারেন। যদি বিস্বাদ লাগে, তাহলে তাতে খানিকটা চিনিও মেশাতে পারেন। কারণ লক্ষণ ও মায়াজম মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রসূ।

মণিপুরকে হিন্দুশূন্য করার চক্রান্ত

হীরক কর

মণিপুর এখন কয়েক মাস ধরে ভয়াবহ দাবানলের মধ্যে রয়েছে। যা দুই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হিসেবে শুরু হয়েছিল তা এখন প্রতিদিনই শিরোনাম হচ্ছে। আর সাধারণ মানুষের ক্ষোভের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি কোণে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। তিনজন মহিলার বিরুদ্ধে যৌন হিংসার একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে। যাতে দেখা যাচ্ছে নগ্ন হয়ে মহিলাদের প্যারেড করতে বাধ্য করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মণিপুরে মোতায়েন করা হয়েছে সেনা। নিরাপদ স্থানে সরানো হয় কয়েক হাজার মানুষকে। শান্তি বজায় রাখতে ফ্ল্যাগ মার্চ করছে সেনা। এর আগে গত মাসে মুখ্যমন্ত্রীর সভাস্থলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল উত্তেজিত জনতা। এই আবহে রাজ্যের আট জেলায় জারি হয়েছে কার্ফু। বন্ধ হয়েছে ইন্টারনেট পরিষেবা।

ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলে 'সেভেন সিস্টার্স' নামে পরিচিত যে সাতটি রাজ্য রয়েছে তার একটি মণিপুর। বাংলাদেশের সিলেট থেকে পূর্ব দিকে অসমের শিলচর জেলা পার হয়ে মণিপুর রাজ্যের সীমানা শুরু। বাংলাদেশের সঙ্গে মণিপুরের সীমান্ত নেই। তবে মণিপুরের পূর্বাংশে মায়ানমারের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে এবং ওই সীমান্তে যথেষ্ট অস্থিরতাও হয়েছে।

মণিপুর উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি রাজ্য, যার রাজধানী ইম্ফল শহর। এর জনসংখ্যা ২৮ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭৯৪ জন— ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী। প্রধান নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হলো মৈতেই, কুকি, নাগা ও পাঙ্গাল। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশই মৈতেই, যদিও গোটা রাজ্যের মাত্র ১০ শতাংশ এলাকায় তাদের বাস। আর ওই ১০ শতাংশ বাদে বাকি অংশে বাস করেন ৩৫টি জনজাতি, যাদের সিংহভাগই নাগা ও কুকি সম্প্রদায়ের। এখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ৪১.৩৯ শতাংশ। খ্রিস্টান ৪১.২৯ শতাংশ। মুসলমান ৮.৪০ শতাংশ। সানামাহিজম-৮.১৮ শতাংশ। অথচ, ১৯৬১ সালে মাত্র ১৯ শতাংশ খ্রিস্টান এবং ৬২ শতাংশ হিন্দু ছিল। মণিপুর এবং উত্তর-পূর্বে খ্রিস্টান সন্ত্রাস বাড়ছে। মৈতেই হিন্দুদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব অর্থাৎ জন্মাষ্টমী নাগা খ্রিস্টান সন্ত্রাসবাদীদের বাধার মুখে।

সম্প্রতি এই ব্যাপক ধর্মান্তরণের দরুন মণিপুর একটি খ্রিস্টান রাজ্যে পরিণত হয়েছে। মিজোরামের পর ভারতের আরও একটি রাজ্য হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে। হিন্দুরা এখন আরও একটি রাজ্যে সংখ্যালঘু। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, তারা নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, জম্মু ও কাশ্মীর, পঞ্জাব এবং মেঘালয়ের মতো মণিপুরেও সংখ্যালঘুদের সুযোগসুবিধা পাবে না।

মণিপুরের এথনিক গোষ্ঠী মৈতেই। আর কুকি হলো অন্যতম একটি বৃহত্তম জনজাতি। ৩ মে-র হিংসা নিয়ন্ত্রণে আনতে মণিপুরের বিভিন্ন জেলায় মোতায়েন করা হয়েছে সেনা এবং অসম রাইফেল পার্সোনেল। বিভিন্ন জেলায় জারি করা হয়েছে কারফিউ। মণিপুরে ১৬টি জেলা রয়েছে। ইম্ফল উপত্যকায় মৈতেইরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এঁরা হিন্দু। উপত্যকার পাঁচটি জেলায়ই এঁদের আধিপত্য রয়েছে। যদিও পাহাড়ি জেলাগুলোতে নাগা ও কুকি জনজাতিদের আধিপত্য। এই কুকি ও নাগারা হলেন খ্রিস্টান। পাহাড়ের চার জেলায় কুকিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

প্রকৃতিগতভাবে বৈচিত্র্যময় মণিপুরে আদিযুগ থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বসবাস এবং সেখানে পাহাড়ি ও সমতলের জনজাতি গোষ্ঠীরা যুগ যুগ ধরেই একত্রে বসবাস করে আসছে। যারা মূলত সিনো-তিব্বতীয় জাতিগোষ্ঠীর। তবে এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে ভারতে 'প্রিন্সলি স্টেট' হিসেবে যে রাজ্যগুলোর মর্যাদা ছিল, তার একটি মণিপুর। কাশ্মীরের মতো মণিপুরও ভারত স্বাধীন হওয়ার পরপরই ভারতে যুক্ত হয়নি। বরং ১৯৪৯ সালে তারা ভারতের যুক্তরাজ্য ব্যবস্থায় যুক্ত হয়। মণিপুরের শাসক মহারাজা বুদ্ধচরণ ভারত সরকারের সঙ্গে এই বিষয়ে চুক্তি সই করেন। আর তা থেকেই এই রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনেরও সূত্রপাত। তবে, সম্প্রতি শুরু হওয়া দাঙ্গা ও হিংসা পরিস্থিতি গত কয়েক বছরের মধ্যে সেখানে সবচেয়ে বড়ো বিক্ষোভ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে।

মণিপুরের সংখ্যাগরিষ্ঠ মৈতেই সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরে একটি মর্যাদার দাবি করে আসছে। সম্প্রতি, হাইকোর্টও তাদের দাবিকে সমর্থন করেছে এবং রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি প্রস্তাব পাঠাতে নির্দেশ দেয়। মণিপুর হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে মৈতেইদের দাবি বিবেচনার নির্দেশ দেয়। কিন্তু রাজ্যের খ্রিস্টান জনজাতি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এতে উদ্বেগ সৃষ্টি হয় এবং হাইকোর্টের ওই আদেশের প্রতিক্রিয়ায় মণিপুরের অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ডাকা মিছিল শুরু হলে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। সহিংস সংঘর্ষের ভিডিয়োচিত্রে দেখা যায়, উন্মত্ত জনতা বিভিন্ন ঘরবাড়ি ও যানবাহনে আগুন দিচ্ছে।

এখন মণিপুর হাইকোর্টের রায়ের পর নাগা ও কুকি সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, এই দাবি পূরণ হলে তারা সরকারের বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে বড়ো প্রতিযোগিতায় পড়বে এবং মৈতেইরা তাদের এলাকায় ভূমি দখল করতে শুরু করবে। তাঁর উপর ভূ-রাজনৈতিক সংকট তো রয়েছেই। ২০২১ সালে প্রতিবেশী মায়ানমারে সামরিক অভ্যুত্থান ও সামরিক বাহিনীর অভিযানের ফলে সেদেশের জনজাতি গোষ্ঠীর অনেকে সীমানা পেরিয়ে মণিপুরে আশ্রয় নেয়। মণিপুরের কুকিরা, যারা জাতিগতভাবে চিন সম্প্রদায়ের সমগোত্রীয়, বলছে, ভারতে আশ্রয় নেওয়া এই শরণার্থীদের বিরুদ্ধে অনৈতিক অভিযান পরিচালনা করছে রাজ্য সরকার। যে কারণে কুকিরা নিজেদের জাতিগত বিদ্বেষের শিকার ভাবছে এবং অসহায়বোধ করছে। ভারতের সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাম্প্রতিক দাঙ্গায় কমপক্ষে ১৩ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং তাদের একটি অংশ সামরিক বাহিনীর ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে।

অল মণিপুর ট্রাইবাল ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কেলভিস নেইশিয়াল বলেন, এই প্রতিবাদের নেপথ্যে প্রধান কারণ হলো মৈতেইরা তফশিলি উপজাতির মর্যাদা চাইছে। তারা এগিয়ে থাকলেও কীভাবে তাদের এসটির মর্যাদা দেওয়া হবে? তিনি বলেন, ওরা যদি এসটির মর্যাদা পায়, তাহলে আমাদের সব জমি কেড়ে নেবে। কেলভিন বলেন, কুকিরা খুব গরিব। তাই তাদের জন্য কোনও স্কুল নেই। ঝুম চাষের ওপর জীবিকা নির্বাহ করে তারা। যদিও মৈতেইদের দাবি, এটা কোনও ইস্যুই নয়। আসল কারণটা হচ্ছে, রাজ্য সরকার যে রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকা থেকে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতে চাইছে, তাতেই ভয় পেয়েছে কুকিরা। তার জেরেই অশান্তির সূত্রপাত।

শুধু তাই নয়, রাজ্য সরকার রাজ্যের বনাঞ্চল চুড়াচাঁদপুরে অবস্থিত ৩৮টি গ্রামকে অবৈধ বসতি বলে ঘোষণার পাশাপাশি উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। এ নিয়ে সম্প্রতি চুড়াচাঁদপুরেও হিংসা ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদে জনজাতিরা মিছিল বের করে, সেই সময় হিংসা চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। জনসংখ্যা এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব উভয় ক্ষেত্রেই মৈতেই সম্প্রদায়ের আধিপত্য। রাজ্য বিধানসভার ৬০টি আসনের মধ্যে ৪০টি আসনে মৈতেই সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। এমন পরিস্থিতিতে জনজাতিদের আশঙ্কা, মৈতেই সম্প্রদায় যদি এসটি মর্যাদা পায়, তাহলে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাবে।

মণিপুরের ৩৬ লক্ষ জনগোষ্ঠীর ৫৩ শতাংশই মৈতেই জাতিগোষ্ঠীর সদস্য, যারা মূলত সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবে চিহ্নিত। এই হিসেব ২০১১ সালের। মণিপুরে মৈতেইরা 'শিডিউলড ট্রাইব' (তফশিলি জাতিগোষ্ঠী) হিসেবে গণ্য হয় না। যে কারণে সরকারি চাকরি, স্বাস্থ্য ও

শিক্ষা ব্যবস্থায় 'সংরক্ষণ সুবিধা'র সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়ে আসছে বলে দাবি মৈতেইদের। ভারতে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করতে আমাদের সংবিধানে এই 'শিডিউলড ট্রাইব' স্বীকৃতির বিধান রাখা হয়েছে। সংবিধানে 'শিডিউলড কাস্ট' (ভারতে যারা মূলত দলিত বা হরিজন সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে পরিচিত) ও 'শিডিউলড ট্রাইব' এদেশের রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু।

ভারতে জনজাতি জাতিগোষ্ঠী হিসেবে পরিগণিত হলেও মণিপুরে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মৈতেইদের 'শিডিউলড ট্রাইব' স্বীকৃতি দিলে অন্য সংখ্যালঘু জনজাতি গোষ্ঠীগুলোর জন্য ওই রাজ্যে প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে— এই আশঙ্কা থেকে মৈতেইদের 'শিডিউলড ট্রাইব' স্বীকৃতির বিরোধিতা করছে রাজ্যের অন্য জনজাতি সংখ্যালঘুরা, যাদের একটি বড়ো অংশ ধর্মীয়ভাবে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। এদিকে মৈতেই সম্প্রদায় 'শিডিউলড ট্রাইব' হিসেবে শ্রেণীভুক্ত হওয়ার জন্য গত কয়েক বছর ধরেই দাবি জানিয়ে আসছিল। কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন বিজেপিও মৈতেইদের এই দাবির পক্ষে সহানুভূতিশীল। তাদের এই দাবিকে সমর্থন জানিয়েই মণিপুরে বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে সেখানে সরকার গঠনও করেছে বিজেপি। এই নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গন সরগরম হওয়ার মধ্যেই গত এপ্রিল মাসে মণিপুর হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে মৈতেইদের দাবি বিবেচনার নির্দেশ দেয়। কিন্তু রাজ্যের অন্য জনজাতি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এতে উদ্বেগ সৃষ্টি হয় এবং হাইকোর্টের ওই আদেশের প্রতিক্রিয়ায় মণিপুরের অল ট্রাইবাল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ডাকা মিছিল শুরু হলে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।

মৈতেইদের উপজাতি হিসেবে সংরক্ষণ দেওয়ার বিরুদ্ধে আরও একটি যুক্তি উঠে আসছে, তা হলো, মৈতেইদের ব্যবহৃত মণিপুরি ভাষা সংবিধানের অষ্টম শিডিউলের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আগে থেকেই। মৈতেইদের অধিকাংশই মূলত হিন্দু। আগে থেকেই তফশিলি জাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাদের। সেই অনুযায়ী যাবতীয় সুযোগসুবিধা ভোগ করেন তাঁরা। তাই ঐতিহ্য, সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে আসলে রাজ্যে নিজেদের আধিপত্য কায়েমই মৈতেইদের লক্ষ্য বলে মত খ্রিস্টান জনজাতি সম্প্রদায়ের।

মণিপুরের হিন্দুরা ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করছে এটা প্রমাণিত সত্য। হ্যাঁ, খ্রিস্টানদের শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এখন ২০২৩-এ মণিপুর একটি খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য। তবে, এখানে নাগাল্যান্ড থেকে নাগাদের অভিবাসনের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে। নাগারা বেশিরভাগ খ্রিস্টান। হ্যাঁ, এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যারা মণিপুরের একটি প্রাচীন অ্যানিমিস্টিক ধর্ম, সানামাহিজম-এ ফিরে আসছেন। তবে, এটি খুব কম সংখ্যায়। মৈতেই খ্রিস্টান যারা প্রকৃত মণিপুরি, যারা খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে, কিন্তু তারা সংখ্যায় খুবই কম। খ্রিস্টানদের শতাংশ বেড়েছে কারণ নাগারা সেই সময়ে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। যখন নাগাল্যান্ডে নাগারা ধর্মান্তরিত হয়। এবং সেইসঙ্গে কুকিরা যারা পাহাড়ের আদি বাসিন্দা তারা ক্রিশ্চিয়ানিটিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে, মণিপুরে

খ্রিস্টান ধর্ম প্রধানত এই কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মিশনারি হলো খ্রিস্টানদের একটি সংস্থা। সারা দুনিয়াতে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ প্রচারকের মাধ্যমে খ্রিস্টানরা খ্রিস্টধর্মের প্রচার করে আসছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে, আজ থেকে পাঁচশো বা ছ'শো বছর আগে খ্রিস্টান মিশনারিরা এই বাঙ্গলায় আসে। পর্তুগিজরা যখন বাঙ্গলায় বা ভারতে আসে তখন সঙ্গে করে খ্রিস্টান মিশনারিদেরও নিয়ে আসে। জেসুইটস ও অগাস্টিনিয়া নামক ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের দুটো দল পর্তুগিজ ব্যবসায়ীদের ছত্রছায়ায় ২০০ বছর যাবৎ বাঙ্গলায় খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে আসছে। মোগল বাদশা আকবর ভারতের বঙ্গ প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান হুগলিতে পর্তুগিজদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দিলে তাদের ছত্রছায়ায় মিশনারিরা এসে এলাকায় গির্জা প্রতিষ্ঠা করে। স্কুল বানায়। হাসপাতাল চালু করে। হুগলিকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে তারা সারা পূর্ব ভারতে নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করে।

এভাবে ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে এতদঞ্চলে খ্রিস্টান মিশনারি তৎপরতা পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে বাদশা শাহজাহান ৭৭৭ বিঘা জমি বিনা খাজনায় (লা-খেরাজ) খ্রিস্টান মিশনারিদের দান করলেন। ফলে তারা আরও বেশি উৎসাহিত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোগল আমলে খ্রিস্টান মিশনারিরা অগাস্টিনিয়ান গির্জা গড়ে তোলে। (আমাদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন দল-উপদল আছে, তেমন খ্রিস্টানদের মধ্যে বিভিন্ন দল আছে, যেমন— জেসুইট, অগাস্টিনিয়ান, ক্যাথলিক, ব্যাপটিস্ট, প্রোটেস্ট্যান্ট ইত্যাদি) মোগল আমলে মোগল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বাঙ্গলায় ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দের পরে ১৩টি অগাস্টিনিয়ান গির্জা গড়ে ওঠে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ছলে-বলে-কৌশলে পুরো ভারতের ক্ষমতা হাতে নিল, তখন মূলত আনুষ্ঠানিকভাবে খ্রিস্টান মিশনারিদের তৎপরতা শুরু হয়।

১৮৯৪ সালে খ্রিস্টান মিশনারিরা কাজ শুরু করার পর বিশ শতকের মাঝামাঝি এসে মিজোরামে বেশিরভাগ পাহাড়ি খ্রিস্টান হয়ে যায়। একই সময়ে মণিপুর খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী পৌঁছে যায় ৩০ শতাংশে। ১৯৫১ সালে একজন পাহাড়ি নেতা ইজরায়েলে গিয়ে জুডাইজমে দীক্ষা নিয়ে তা অনুসরণ করেন। সেখান থেকে দেশে ফিরে এসে মিজোদের ইহুদি সম্পৃক্ততার বিষয়ে ব্যাপক প্রচার চালান। এর পর থেকে মিজোরাম, মণিপুর কথিত ইহুদি ধর্মমতে ধর্মান্তরণ বাড়তে থাকে। এতে বর্তমানে মিজোরামে ইহুদি সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশ আর খ্রিস্টান সংখ্যা অনেক কমে ৪০ ভাগে নেমে এসেছে। এর আগে খ্রিস্ট ধর্মমত গ্রহণকারী মিজো কুকি শিনরা প্রধানত ইহুদি ধর্মমতে চলে আসায় ইহুদিসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমছে খ্রিস্টানসংখ্যা। এই প্রবণতা অব্যাহত থাকলে অচিরেই রাজ্যটিতে ইহুদিসংখ্যা খ্রিস্টানদের ছাড়িয়ে যাবে।

মিজোরামে 'শিঙল্যাং ইজরায়েল' প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গোপন সমঝোতার কথা জানা যায়। এই সমঝোতা অনুসারে মিজোরামে একটি ইহুদি দেশ প্রতিষ্ঠার জন্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সহযোগিতার বিনিময়ে ইহুদিরা পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে খ্রিস্টান দেশ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করবে। ইজরায়েলে যে এক লক্ষের কাছাকাছি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইহুদি রয়েছে তাদের প্রয়োজনে ফিরিয়ে আনা হতে পারে। বিশ্ব রাজনীতির নিয়ম অনুসারে কোনো অঞ্চলে নতুন কোনো বিন্যাস ঘটাতে হলে সেখানে নানা ইস্যুকে কেন্দ্র করে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে হয় গত ১০ বছরে মণিপুরে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে এর যোগসূত্র রয়েছে। আর এতেই বাদ সেধেছে রাজ্যে বিজেপির নতুন সরকার।

মণিপুরে এখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বাইরে কিছু হচ্ছে না। মৈতেই বনাম কুকি-নাগাদের সংঘাত এখন আসলে হিন্দু-খ্রিস্টান সংঘাত। মৈতেইরা হিন্দু। কুকি-নাগারা খ্রিস্টান। শুরু হয়েছিল তফশিলি জনজাতি হওয়া নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ মৈতেইদের দাবি ঘিরে। কেন কুকিরা পাহাড়ে বাড়তি সুবিধে পাবে— নির্বাচনের সময় এই দাবি ঘিরে বিজেপি বিধানসভা নির্বাচনে ফায়দা তোলার চেষ্টা করেছিল। সংঘর্ষের এখনকার পরিস্থিতিতে মায়ানমারের শরণার্থীরা কুকিদের পাশে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় উত্তেজনা বল্গাহীন। অহিংসা ছড়াচ্ছে মূলত হিন্দু বনাম খ্রিস্টান গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে। মারা গিয়েছেন অজস্র কুকি বা নাগা, কেউ দিনের পর দিন ঘরছাড়া। ৩ মে-র পরে ৪১ হাজার ৪২৫ জন মানুষ গৃহহীন। ১০১-এর বেশি মানুষ মৃত। ৬,১৩৭ বাড়ি লুট হয়েছে বা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ৩১৭-র বেশি চার্চ ধ্বংস হয়েছে। ১৭০-এর বেশি গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বাতাবরণে কোনো হিংসাই এক তরফা থাকছে না। তারা নাকি মায়ানমারের শরণার্থীদের সাহায্য নিয়ে চেষ্টা করছে বিস্ফোরণের।

যদিও মণিপুরের সমস্যা ঘোরালো হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে এক বার্তায় বলেছেন, 'গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় হিংসা এবং ঘৃণার কোনও স্থান নেই।'

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূখণ্ড নিয়ে 'কুকি-চিন রাজ্য' নামে একটি পৃথক রাজ্যের দাবিতে কেএনএফ-এর সশস্ত্র শাখা কুকি-চীন ন্যাশনাল আর্মি (কেএনএ) মনে করে, পাহাড়ের ৯টি উপজেলা তাদের পূর্বপুরুষদের আদিম নিবাস, ব্রিটিশ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে দখলদাররা অনুপ্রবেশ করে এবং এই ভূমি দখল করে নেয়, ফলে তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়।

ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এক পদস্থ অফিসারের মতে, সংগঠনটি ২০১৭ সালে কেএনভি নামে সশস্ত্র সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরবর্তীতে মণিপুর রাজ্যের এবং বার্মার কারেন বিদ্রোহী গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করে। একই বছরে সংগঠনটির কয়েক শো সদস্যকে মণিপুর রাজ্যে ও পরে শতাধিক সক্রিয় সদস্য কাচিন, কারেন প্রদেশ ও মণিপুর রাজ্যে প্রশিক্ষণে পাঠায়। ২০১৯ সালে কমান্ডো প্রশিক্ষণ শেষে সশস্ত্র অবস্থায় পার্বত্য জেলায় ফিরে আসে। বাংলাদেশের রুমা সীমান্ত ও ভারতের মিজোরাম সীমান্তের জাম্পুই পাহাড়ে একে-৪৭-সহ ভারী অস্ত্রে সজ্জিত এই সংগঠনের মোট ৩ হাজারের বেশি সদস্য আছে। খ্রিস্টানদের ওপর সংখ্যাগুরুদের ধর্মীয় আগ্রাসন ও বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্যই মূলত এই কেএনএফ সংগঠনটি পার্বত্য চট্টগ্রাম-সহ মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড নিয়ে পৃথক দেশের দাবি করছে।

গত ২৪ মার্চ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের মিজোরাম রাজ্যের লংতলাই জেলার পারভা থেকে অবৈধ সরঞ্জাম-সহ এই সংগঠনের ৬ সদস্যকে গ্রেপ্তার করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এরা বাংলাদেশের বান্দরবনের রুমার বাসিন্দা বলে বিএএসফের কাছে পরিচয় দেয়। গত ১২ এপ্রিল পারভা ১১৯ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ সশস্ত্র সরঞ্জাম-সহ আরও ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। চার জনের মধ্যে ২ জন রুমা বাজার ঘেষা এডেন ও লাইরুনসি পাড়ার বাসিন্দা। কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ)-এর আত্মপ্রকাশ পাহাড়ে সংঘাত আরও বাড়াবে বলে মনে করছেন মণিপুরের স্থানীয়রা। 'কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট'— এই নামটি দেখেই বুঝতে অসুবিধা হয় না এর পিছনে আছে কারা। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন, চীন। ■

তপ্ত মণিপুর এবং চিত্রাঙ্গদার সত্য সন্ধানটাও জরুরি

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

কেন্দ্রীয় সরকার দেশের মহামান্য শীর্ষ আদালতের নিকট জানাল— নারী লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে অস্থিতিস্থাপক ভাবে তারা কঠোর। মণিপুর নারী লাঞ্ছনার ভিডিয়ো গেল সিবিআইয়ের হাতে। এতো গেল সরকারি পদক্ষেপ এবং আইনি প্রশাসনিক তৎপরতা। আমাদের লজ্জার অধ্যায় কতবার মাথানত করল?

আমাদের লজ্জায় মাথা হেঁট। নিন্দার শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা নিজেদের মানুষ বলতেও দ্বিধাগ্রস্ত। আমরা দিশাহীন কলঙ্ক মোচনে। যখন পথের মাঝে নারী বিবস্ত্র হয়ে লাঞ্ছিতা হয় তখন তা সভ্যতার কলঙ্ক। দেশের লজ্জা। সারা দেশ মণিপুরের দিকে তাকিয়ে। যে নারীলাঞ্ছনা হলো, যেভাবে দু'জন নারীকে পথের মধ্যে বিবস্ত্র করা হলো, তা ধর্ষণের ঘৃণ্যতাকেও ছাপিয়ে যায়। দেশ উত্তাল। পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল। হোক উত্তাল। এমন অসভ্যতার বিরুদ্ধে সবাই উত্তাল হোক। সেটাই চাই। সেটাই সত্য প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করে।

কিন্তু উত্তাল শুধু মণিপুর নিয়েই কেন? কেন একই প্রতিবাদ, চিৎকার? ছি: ছি:, দেখছি না মালদার বামনগোলার ঘটনা। খোলা হাটে সেখানেও নারী নির্যাতন। দেশ জুড়ে বিরোধীদের একটাই আওয়াজ, সব মোদী সরকারের ব্যর্থতা। মোদী সরকার যেন দুঃশাসন। যেন এই ঘৃণ্যতার প্রযোজক। এই মিথ্যা ন্যারেটিভ তৈরি করার যে আপ্রাণ প্রয়াস চলছে তা মণিপুরের জঘন্য ঘটনার চাইতেও আরও জঘন্য। যা কোনো গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সামাজিক রূপায়ণের প্রস্তাব রাখে না। তৈরি করে বিশৃঙ্খলা। যে বিশৃঙ্খলা উত্তেজনা খুঁজে খুঁজে বিজেপি শাসিত অঞ্চলের জন্যই যেন সীমাবদ্ধ। যেখানে বিজেপির শাসন নেই সেখানের নারী নির্যাতন তবে কেন মিডিয়ার আলো পায় না? বিরোধীদের আওয়াজ ওঠে না? বুদ্ধিজীবীর মোমবাতি মিছিল দেখা যায় না? প্রতিবাদের সুর ধিক্কারের স্বর বেছে বেছে সরকার দেখে, রাজনীতির রং দেখে হয় বলেই নারী সুরক্ষা তার সর্বজনীন রূপ পাচ্ছে না। প্রসঙ্গ মণিপুরেই থাকি; এত যখন বিরোধীদের মাথাব্যথা।

প্রথমত, যেভাবে মণিপুর-সহ সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতকে দেখানো হচ্ছে, যেন ওখানে মহিলারা আদৌ সুরক্ষিত নন। তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মণিপুর বিক্ষোভের পর থেকে (২২ জুলাই পর্যন্ত তথ্য) মোট ৬০৬৮টি এফআইআর দায়ের করা হয়। যার মধ্যে একটি ছিল ধর্ষণের অভিযোগ। সংখ্যাটা শূন্য হলে তা অনেক অহংকারের হতো নিশ্চিত কিন্তু মণিপুরের নারী সম্ভ্রম যেন ভূতলে পতিত এই ন্যারেটিভের কোনো তথ্যগত ভিত্তি নেই। যেটা আছে তাকে বলে সংবাদ ক্রয়- বিক্রয়ের তাড়না। এবং রাজ্যটা বিজেপি শাসিত, কেন্দ্র ও রাজ্য বিরোধিতার এ এক সুবর্ণ সুযোগ দেশের বিরোধীদের কাছে।

না, পলাতক নন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী, যিনি কংগ্রেস, তৃণমূল বা ইত্যাদি দলগুলির চোখে বিজেপির মানুষ। প্রথমত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই নারী লাঞ্ছনার বিষয়ে সরব হন। এবং অভিযুক্তদের চিহ্নিতকরণ ও কঠোরতম শাস্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়। তারপর মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিংহ, তিনি তো রাজভবনে পদত্যাগ পত্র দিতে গেলেন। দিনটা ছিল ৩০ জুন। অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। নুপিলাল মেমোরিয়াল কমপ্লেক্সের কাছে, যা মুখ্যমন্ত্রী দপ্তর থেকে ১০০ মিটার দূরত্বে, মণিপুরের মেয়েরা অবরোধ করল। না যেতে দেবে না মুখ্যমন্ত্রীকে। করতে দেবে না পদত্যাগ। মণিপুরের সব চিত্রাঙ্গদারা বীরেন সিংহকে ভরসা করছে। তাঁর পদত্যাগপত্র কেড়ে ছিঁড়ে দেয় কোনো এক মণিপুরী কন্যা। তারা সবাই ভরসা রাখে এই মুখ্যমন্ত্রীর ওপর। এটাই বলে দেয় তপ্ত মণিপুর, কিন্তু মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষার নিশ্চয়তা মহিলারাই বীরেন সিংহের ওপর ন্যস্ত করলেন। মণিপুরের মেয়েরাই চায়, তাদের ভূমিপুত্র বীরেন সিংহ থাকুন মুখ্যমন্ত্রীর আসনে। রক্ষকের আসনে। তাই, বীরেন সিংহ, বিজেপি বা মোদী কেউই যে নারী সুরক্ষাকে 'ছোটো ঘটনা' বলে দেখেন না, তা উত্তেজিত মণিপুরের মেয়েরাই প্রতিষ্ঠিত করল।

উত্তর পূর্ব ভারতে জনজাতি এবং গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব সমস্যা আছে। কিন্তু তার সঙ্গে নারী সম্ভ্রমকে গুলিয়ে ফেললে তা অবৈজ্ঞানিক চর্চা হবে। ২০১৯ জাতীয় মহিলা কমিশনের তথ্যানুযায়ী, ধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ মণিপুরে একটিও ছিল না। একই ছবি ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরামেও। এমনকী অরুণাচলেও। যে নারী লাঞ্ছনার ঘটনা মণিপুরে ঘটলো তার হাজার বার ধিক্কার করতে কুণ্ঠিত হবে না যে কোনো সমাজদরদি মানুষ। মণিপুরের সমস্যা নারী সুরক্ষা নয়। যেটা গত এক দশক ধরে ক্রমবর্ধমান রূপে ধরা দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। যেখানে একটা পঞ্চায়েত নির্বাচনেও মহিলাকে পথমধ্যে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। নাবালিকা ধর্ষণ, রাজনৈতিক হানাহানিতে মহিলা সম্ভ্রম নিয়ে ছেলেখেলা যে রাজ্যের স্বাভাবিক ঘটনায় উপনীত। মণিপুরের মানুষ সে সমস্যার কথা জানে না।

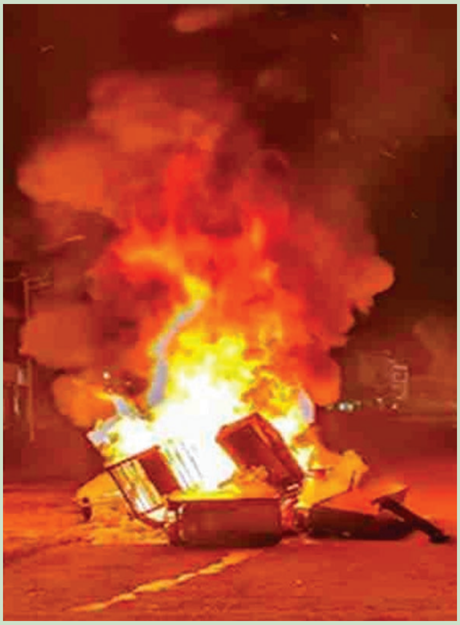

জনজাতির বিক্ষোভ সমস্যা চলছে মণিপুরে। তার সবটুকু খোঁজ পাই না,

ফ : ৪

রাখিও না আমরা। মণিপুরের সমস্যা কোনো পঞ্চায়েত দখল কিংবা আসন দখলের নয়। তা অত্যন্ত জটিল এবং পুরাতন সমস্যা। একদিকে জনগোষ্ঠীর মধ্যে রেষারেষি, অন্যদিকে সহিংসতা এবং চীন- মায়ানমার উসকানিতে গোষ্ঠী সংঘর্ষ, মাদক কারবার। মণিপুরের মাটিকে তপ্ত করেছে বারে বারে। ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর থেকেই মায়ানমারের জঙ্গিদের মদতে জঙ্গল ক্যাম্প তৈরি হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে তার আগে থেকেই কুকিদের দিয়ে আফিম চাষ করতো চীনারা। মায়ানমার এই চোরা বাজারের অর্থ পেত। মাদকাসক্ত করে রাখতে চাইছিল জনজাতিদের। তারা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েও যেন হচ্ছিল না। ২০১৪ সালে মোদী সরকার পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন করল। এনএসসিএন এবং ভারত সরকারের মধ্যে 'নাগা চুক্তির' পর সহিংসতা ৮০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। মানুষ জঙ্গি কার্যকলাপ ছেড়ে ক্রমশ মূলস্রোতে ফিরেছে। এর মধ্যে মণিপুর হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত— মৈতেইদের জনজাতির মর্যাদা দিতে হবে।

ফলে তারা নেহরু পলিসির দ্বারা আর সীমাবদ্ধ অঞ্চলে থাকবে না। রাজ্যের সর্বত্রই বসতি স্থাপন এবং জমি ক্রয় করতে পারবে। তা কুকি ও নাগারা মেনে নিচ্ছে না। এবং তীব্র বিক্ষোভে তপ্ত মণিপুর। এই অগণতান্ত্রিক বিক্ষোভে মদত দিচ্ছে চার্চ। মৈতেই জনজাতিরা হিন্দু। তাদের ওপর নির্যাতন, উপদ্রব মাত্রাছাড়া হয়েছে চার্চের প্ররোচনায়। গৃহহীন মৈতেই পরিবার আশ্রয় নিয়েছে সিটন, মৈরাঙ্গ, বিষ্ণুপুর ও ইম্ফলের হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলে।

মায়ানমার সেনা চীনের মদতে মণিপুর সহিংসতায় সর্বদা উসকানি দেয়। তারা মৈতেই জনগোষ্ঠীকে ভ্যালি বেসড ইনসারজেন্ট গ্রুপ বলে চিহ্নিত করে। যারা আজ দুর্দশার কিনারায়। মণিপুরের গোষ্ঠী সহিংসতা ৩ মে শুরু হলে ১৩ জুন পর্যন্ত অন্ততপক্ষে ৬০ হাজার হিন্দু মৈতেই গৃহহীন হয় খ্রিস্টান নাগা কুকিদের সহিংসতায়। এরও আগে ১০ মার্চ, কুকি সিভিল সোসাইটির সংগঠন ইনডিজেনাস লিডারস ফোরাম চুড়াচাঁদপুর, তেঙ্গনোপাল, কাঙ্গপোকপি, জিরিবাম পার্বত্য অঞ্চলে মিছিল প্রদর্শন করে। কিন্তু তাতো ১৯ এপ্রিলের আগের সময়। ১৯ এপ্রিল, মণিপুর শীর্ষ আদালত মৈতেইদের সিডিউলড ট্রাইব (এসটি) সংরক্ষণ শ্রেণীতে রাখার নির্দেশ দিলে, কুকি ও নাগারা ক্ষেপে ওঠে। তবে ১০ মার্চ কী ঘটল? বীরেন সিংহ কুকি অধ্যুষিত অঞ্চলে বনভূমি সংলগ্ন জমির ওপর সরকারি দখল নিতে বেশ কিছুদিন থেকেই তৎপর। কারণ কুকি অধ্যুষিত অঞ্চলে আফিম চাষ মাত্রাতিরিক্ত হচ্ছিল।

শুধু তাই নয়, মায়ানমারি অনুপ্রবেশকারীদেরও ডেরা হচ্ছিল কুকিদের অঞ্চলগুলি। এ কথা বিজেপি বলছে না। কোনো রাজনৈতিক অভিযোগ নয় এটা। সাঙ্গমুয়া হাংসিং এবং তাওয়ান ভলতের 'East Mojo'-তে প্রকাশিত লেখায় উল্লেখ ছিল এই গভীর বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যার কথা। সেই দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করতে বীরেন সিংহ ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই ইন্দো-মায়ানমার সীমান্তে নতুন ভাবে ৩৪টি পুলিশ পোস্ট নির্মাণ করেন। বায়োমেট্রি বাধ্যতামূলক করা হয়। এরই মাঝে কেন্দ্রীয় সরকারও ইম্ফলের সহযোগিতায় সীমান্ত অঞ্চলে ওয়্যার ফেনস (Wire fences) নির্মাণ করেছে। বীরেন সিংহ সরকার ইন্দো-মায়ানমারের ১,৬৪০ কিলোমিটার সফট বর্ডারকে হার্ড বর্ডারে রূপান্তরিত করেছেন। তাতেই মায়ানমার মদতে থাকা কুকি জনজাতিদের বেজায় ক্ষোভ। সরকারি সুরক্ষাকে তারা encroachment বলে অপপ্রচার করছে। হ্যাঁ, বীরেন সিংহ সরকার এমন কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে যা দশকের পর দশক মণিপুরের গা-ছাড়া হাবভাবের সঙ্গে মানানসই না। তাই কুকি নাগা যারা মণিপুরকে কার্যত মুক্তাঞ্চল মনে করত, চলত মাদক সেবা থেকে অনুপ্রবেশকারীর দেখভাল। তাতে আজ আচমকাই ব্যাঘাত ঘটছে।

তার ওপর আবার মৈতেইদের আদালত কর্তৃক এসটি-র স্বীকৃতি —সব মিলিয়ে কুকি জনজাতিদের উত্তেজনা। এবং সে উত্তালতা যুক্তিপূর্ণ ভাবে দেখলে Good Governance-এর বিরুদ্ধে! স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেস-সহ অন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রকৃত কারণ না জেনেই বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যাচার করে এটাই অপপ্রচার করছে মণিপুরে জনজাতিদের বিক্ষোভে নারী সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে।

ধরে নিলাম, সম্পূর্ণ ভাবে মোদী সরকার ব্যর্থ। বিরোধীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ আমরা সবাই সহমত হই। বলি, মোদী সরকার মণিপুর সামলাতে ব্যর্থ। রাহুল গান্ধী এবং তাঁর পরিবার সামলাতে পারবেন তো যদি মণিপুরের সবটুকু দায়িত্ব এই মুহূর্তে তাঁদের ওপর ন্যস্ত করা হয়? কিন্তু রাহুল গান্ধী তো মণিপুরে ঢুকতেই পারলেন না! যে মণিপুরের জন্য তাঁদের এত দরদ, সেই মণিপুরবাসীরাই তাদের বিতাড়িত করছে। মণিপুর প্যাট্রিয়টিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক নাওরেম মোহেন খোলা চিঠিতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন আজকের মণিপুরের অশান্তির মূল কারণ কংগ্রেস এবং নেহরুর ব্রিটিশপন্থী নীতি। তিনি তিক্ত চিঠিতে লিখছেন 'Rahul ji, I appreciate your concern for the present violence crisis in Manipur is the outcome of the continuation of the British Policy of Meitei containment by the Indian National Congress Party by encouraging illegal immigration from Myanmar and Bangladesh and converting them into a vote bank for your party, otherwise known as Congress.'

তারপরেও কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ বিজেপিকে ধিক্কার জানানোর নির্বুদ্ধিতায় মাতেন। বাকি থাকল কিছু অর্ধসত্য তথ্য সম্প্রচারি গণমাধ্যম। তারা এক একটা জর্জ সোরোস পন্থী সংবাদ মাধ্যম। যারা মোদী নিন্দা করে বাড়তি বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুই পায় না। সে সব বড়োই তুচ্ছ বিষয় মোদী সরকারের কাছে। কারণ, উদ্দেশ্য যেখানে সংহিংসতা মুক্ত, চার্চ একাধিপত্যহীন, অনুপ্রবেশ চোরা চালান অভেদ্য মণিপুর গঠন। যে মণিপুরের মাটিতে মাথা উঁচু করে চিত্রাঙ্গদারা বলবে 'রাজেন্দ্রনন্দিনী'। সেই মণিপুরের লক্ষ্যে অনেক চড়াই উতরাই আছে। মণিপুরের পরিস্থিতি সুখকর বলে বাস্তব সত্যকে বিকৃত করব না। কিন্তু সুস্থ মণিপুর তৈরির উদ্দেশ্যকে, অনুশীলনকে যথাযথ ওজনের সঙ্গে বুঝতে না পারলে তা অনেকটাই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অর্ধসত্য প্রচার হবে। নালিশ করলেই হয় না। যারা তা করছেন তারা কিন্তু নিরপরাধ বলে খালাসের যোগ্য নয়।

বিরোধিতার আবিলতা ছেড়ে যৎকিঞ্চিৎ সামাজিক, মানবিক ও বাস্তবিক দৃষ্টিকোণে দেখলে বোঝা যাবে মণিপুর আর দিল্লির দূরত্ব আগের চাইতে কত কমে গেছে। পাহাড়ে-পথে- বনে চিত্রাঙ্গদা চলে। যে বলে 'নহি সামান্যা নারী'। ■

পশ্চিমবঙ্গে বস্ত্রহরণের দায় কি মুখ্যমন্ত্রী এড়াতে পারেন?

মণীন্দ্রনাথ সাহা

মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা ছিলেন মণিপুরের রাজকন্যা। পিতার নাম চিত্রবাহন। সেই চিত্রাঙ্গদার রাজ্য মণিপুরে নারীর বস্ত্রহরণ হয়েছে। সেখানে চলছে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দাঙ্গা, লুট, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন। আর সে রাজ্যে যেহেতু বিজেপি শাসনক্ষমতায় সেহেতু বিরোধীদের আস্ফালনও বেশি। তবে বিরোধীদের আস্ফালনকে দোষ দেওয়া যায় না। মণিপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুধু বিরোধী দলের লোকেরাই নন, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল মানুষ সোচ্চার হয়েছেন। সোচ্চার হয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। কেননা এ অনাচার, অত্যাচার, অসভ্যতা কেউ কখনোই সহ্য করে না, করবে না। এর দায় রাজ্যের শাসকদলকে নিতেই হবে। শাসক সবকিছু দেখে, জেনেও চুপ করে বসেছিল কেন? যেখানে দু'জন মহিলাকে বিবস্ত্র করে রাজপথে ঘুরিয়েছে দাঙ্গাবাজরা। সেখানে পুলিশ, প্রশাসন ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বসেছিল কেন? মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন্দ্র সিংহকে এর দায় নিতেই হবে।

এতো গেল মণিপুরের কথা। এবার জেনে নেওয়া যাক দেশের আর এক চিত্রাঙ্গদার রাজ্যের ঘটনা। এক সময় ভারতের মধ্যে যে রাজ্যকে শিক্ষা, সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসেবে সকল ভারতবাসী এমনকী বিশ্ববাসীও মেনে নিত, যে রাজ্য শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মতো মনীষীদের আবির্ভাবে ধন্য হয়েছিল এবং সে রাজ্য— 'আমি সতেরও মা অসতেরও মা' বলার মতো সাহসিনী সারদা মাতার আবির্ভাব স্থল, সেই রাজ্যেও হামেশাই চলছে দ্রৌপদীদের বস্ত্রহরণ এবং তা চলছে কোনো রাখঢাক না করেই। সেই রাজ্যের নাম আমাদেরই এই পোড়া রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। এখানেও শাসন ক্ষমতায় আছেন আর এক চিত্রাঙ্গদা।

> যাঁরা নির্যাতিত বা খুন হলেন, তাঁরা সকলেই আমাদের দেশের নাগরিক। কেউ বাস করেন মণিপুরে, কেউ রাজস্থানে, কেউ-বা পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্য ভিন্ন হওয়ার কারণে অপরাধকে আড়াল করার প্রবণতা থাকবে কেন?

বঙ্গীয় চিত্রাঙ্গদার রাজ্যে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন চলছে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভোটকে কেন্দ্র করে। সংবাদমাধ্যমের দৌলতে জানা গিয়েছে হাওড়ার পাঁচলায় শাসক দলের বিরোধী প্রার্থীকে বিবস্ত্র করে তাঁর শ্লীলতাহানিও হয়েছে। আবার মালদহ জেলার বামনগোলা থানার পাকুয়াহাটে চুরির অপবাদে দুই মহিলাকে সিভিক পুলিশের সামনে বিবস্ত্র করে ঘোরানো হয়েছে। ভাবুন একবার, কী নিদারুণ ঘটনা চলছে সংস্কৃতির পীঠস্থান চিত্রাঙ্গদার রাজ্যে। মণিপুরের ঘটনায় যে চিত্রাঙ্গদা সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদে মুখর ছিলেন তিনি তাঁর রাজ্যে তিনজন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হওয়া সত্ত্বেও চুপ কেন? এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বঙ্গীয় চিত্রাঙ্গদা কি তাঁর রাজ্যের দ্রৌপদীদের বস্ত্রহরণের দায় এড়াতে পারেন? উত্তর চায় বঙ্গবাসী।

২০ জুলাই মণিপুরের ঘটনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে লিখেছিলেন, 'ওই ভয়াবহ ভিডিয়োটি দেখে আমার হৃদয় ভেঙে গিয়েছে। দুই মহিলার ওপর উন্মত্ত জনতার

থানার সামনে ঝাঁটা হাতে মহিলাদের প্রতিবাদ।

নির্মমতা দেখে মনে তৈরি হয়েছে ক্রোধ।'

আমরা অর্থাৎ সমগ্র বঙ্গবাসী মুখ্যমন্ত্রীর হৃদয় ভেঙে যাওয়া এবং ক্রোধের সঙ্গে সহমত পোষণ করি। কেননা দেশের যে কোনো প্রান্তে মহিলাদের ওপর নির্যাতন কোনো সভ্য মানুষ সমর্থন করেন না। সবাই চায় নারী নির্যাতনকারী অপরাধীদের কঠোর শাস্তি হোক। তাদের এমন শাস্তি দেওয়া হোক যেন ভবিষ্যতে আর কেউ কোনোদিন নারী নির্যাতনের চিন্তা করার আগে অন্তত দশবার ভাবে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর আবেগের সঙ্গে সহমত পোষণ করছি।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই ভাবাবেগ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী রাজনীতিক এবং সাধারণ মানুষও। কেননা মুখ্যমন্ত্রী মণিপুরের ঘটনা নিয়ে যতটা সরব হয়েছেন ঠিক ততটাই মৌনতা অবলম্বন করেছেন তার নিজের রাজ্যের একইরকম ঘটনা নিয়ে। রাজ্যের হাওড়া জেলার পাঁচলায় এবং মালদহ জেলার পাকুয়াহাটে যে জঘন্যতম নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে তাতে সাধারণ মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত, লজ্জিত ও ক্রোধান্বিত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এনিয়ে অপরাধীদের কোনো বার্তা দেননি বা কোনো নিন্দা করেননি। অথচ মণিপুরের ঘটনা প্রসঙ্গে সে রাজ্য সরকার অপরাধীদের প্রতি কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন— 'এই ঘটনায় গোটা দেশের মাথা নত হয়েছে। মণিপুরের মা-বোনেদের অসম্মান যারা করেছে তারা রেহাই পাবে না। মহিলাদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন নিজের নিজের রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখেন।'

কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলছেন— আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দূরের ঘটনা খুব তাড়াতাড়ি জানতে পারেন কিন্তু কাছের ঘটনা তিনি কোনোদিনই জানতে পারেন না। যেমন মণিপুরের ঘটনা জানলেও হাওড়া ও মালদার ঘটনা হয়তো তিনি জানতেই পারেননি। যেমন ইতিপূর্বে উত্তরপ্রদেশের হাতরাসের ঘটনা তিনি খুব তাড়াতাড়ি জানতে পেরে দিনের বেলায় টর্চ জ্বালিয়ে কলকাতাকে আলোকিত করেছিলেন। কিন্তু ঠিক তার দু'দিন পরে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরে ১২ বছরের নাবালিকাকে অপহরণ করে ধর্ষণ করে ইসলামপুরকে গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত করলেও তখন কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর টর্চ আর জ্বলেনি।

ঠিক তেমনি মণিপুরের ঘটনায় যখন মুখ্যমন্ত্রীর হৃদয় ভেঙে গেল এবং ভীষণ ক্রোধ হলো ঠিক তার কয়েকদিনের মধ্যে রাজ্যের হাওড়া জেলার পাঁচলা এবং মালদহ জেলার পাকুয়াহাটের ঘটনায় তাঁর হৃদয় কেন ভেঙে গেল না এবং ভীষণ ক্রোধ কেন হলো না, এ প্রশ্ন কিন্তু তুলছে সাধারণ মানুষ।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস-এর তথ্য অনুযায়ী দেশের মধ্যে নারী নির্যাতনের নিরিখে রাজস্থান প্রথম এবং পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে। রাজস্থানে কংগ্রেস এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় রয়েছে। অথচ মণিপুর কাণ্ডের প্রতিবাদে সবচেয়ে বেশি গলার স্বর চড়িয়েছে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস। অর্থাৎ চোরের মায়ের বড়ো গলা।

শুধু ধর্ষণকাণ্ড নয়, পশ্চিমবঙ্গে সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একের পর এক যেভাবে বিরোধীদের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে এবং তার ফলে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে, তা মধ্যযুগের বর্বরতাকেও হার মানাচ্ছে। রাজ্যের আনাচে কানাচে এখন শুধু অসহায় মানুষের হাহাকার আর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। প্রায় একবছর আগে বীরভূমের বগটুই গ্রামে শিশু ও মহিলা-সহ ১০ জনকে যেভাবে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে, সেটাও এক ধরনের অন্যায় শুধু নয়, চরমতম ভয়াবহ ঘটনা— এটা কিন্তু অস্বীকার করা যাবে না। পশ্চিমবঙ্গের যে মানুষগুলিকে বিনা অপরাধে খুন করা হলো, তাঁরা কি আমাদের দেশের নাগরিক নন? তাঁরা কি আমাদের সহনাগরিক নন? এতগুলি প্রাণ চলে গেল, এর জন্য দায়ী যারা, তাদের কি কোনোদিন শাস্তি হবে? মণিপুরে যা ঘটছে, সেটা যেমন গুরুতর অন্যায়, সেই একই অন্যায় পশ্চিমবঙ্গেও হচ্ছে। কিন্তু একই ধরনের ঘটনাকে দেখার ধরন কেন আলাদা আলাদা হবে? যাঁরা নির্যাতিত বা খুন হলেন, তাঁরা সকলেই আমাদের দেশের নাগরিক।

শুধু কেউ বাস করেন মণিপুরে, কেউ রাজস্থানে, কেউ-বা পশ্চিমবঙ্গে। রাজ্য ভিন্ন হওয়ার কারণে অপরাধকে আড়াল করার প্রবণতা থাকবে কেন? একই ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা হবে কেন? রাজ্যের দ্রৌপদীরা এবং সাধারণ নাগরিকরা এর উত্তর চায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে— কেন বারবার রাজ্যে দ্রৌপদীদের বস্ত্রহরণ হবে? ■

ধর্মজিজ্ঞাসা—বারো

সর্বভূতে ঈশ্বর জ্ঞানেই মেলে তাঁর দর্শন

নন্দলাল ভট্টাচার্য

এ সেই চিরন্তন বিরোধ, যার মূলে রয়েছে সীমাহীন অজ্ঞতা। এরই কারণে— 'পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,/মূর্তি ভাবে আমি দেব— হাসে অন্তর্যামী।' তিনি হাসেন— তাই তো এতো ভ্রান্তি। এতো বিরোধ— হানাহানি।

অথচ এ সবই যে অলীক মরীচিকা— এ যে মিথ্যা একটা দম্ভ, এটা কেবল সাধারণ মানুষের মধ্যেই রয়েছে, তা কিন্তু নয়, প্রজ্ঞাবান বলা হয় যাঁদের, তাঁরাও এই একই বোধের অন্ধকারে ডুবে থাকেন প্রায়শই। তাই বা কেন, মানুষের আরাধ্য যে দেবতা, সমস্ত দিক থেকেই সকলের অনেক ঊর্ধ্বে যাঁদের অবস্থান, হীরকদ্যুতি-সম উজ্জ্বল যাঁরা, তাঁরাও মুক্ত নন এই অহংবোধ থেকে। তাই ভুল করেন তাঁরাও। জড়িয়ে পড়েন ভ্রমের মায়াজালে। সেই ভ্রমেই এই মর ও অমর লোকের সৃষ্টির আদি কারণ যিনি, যিনি এই জীব ও জড় জগৎ-সহ বিশ্বনিখিলের স্রষ্টা, দ্রষ্টা যিনি সবকিছুর, যিনি পালক এবং বিনাশক, তাঁর কথা জেনে অথবা না জেনেই বারে বারে ভুলের ফাঁদে বিভ্রান্ত হন তাঁরা। তাঁরা যে ফুঁ দিয়ে ফোলানো বেলুন এটা ভোলেন না বলেই চুপসে যান যে কোনো মুহূর্তে ফেটে গিয়ে। যাঁর দৃষ্টিপাত অথবা ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়ে না, তরঙ্গ হিল্লোলে যে ভঙ্গিতে হয় না নদীর জলও, তাই বা কেন, এই মহাবিশ্বই হয়ে যায় অস্তিত্বহীন, সেই সর্বময়, সর্ব শক্তিমান— সমস্ত গুণের আধার ব্রহ্মার কথা বিস্মরণ হয়ে বৃথা বড়াই করে দেবতারাও পদে পদে হন বিড়ম্বিত। আবার বিড়ম্বনার মধ্য দিয়েই হন তাঁরা চৈতন্যময়— অবশ্যই সেই ব্রহ্মেরই ইঙ্গিতে।

ব্রহ্ম লীলাময়। তিনি এক। আবার লীলারঙ্গে তিনি হন বহু। সেই বহু রূপেই তিনি কখনও দেন মান। কিন্তু সেই মান আপন গুণেই অর্জিত বলে যখন জাগে অভিমান তখনই সত্যদর্শনে চূর্ণ করেন সব। এটাই তাঁর লীলা বিলাস।

সেবার যেমন। দেবতাদের মান-মর্যাদা একটু উন্নত করার জন্য এক লীলায় মাতলেন ব্রহ্ম। অসুরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দেবতাদের দিকে ঢলে পড়লেন তিনি। তাঁর সেই ভূমিকা বা ইচ্ছার ফলেই অসুররা হেরে গেল। অসুরদের হার দেখে দেবতাদের সেটা উল্লাস। দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু থেকে শুরু করে একবারে সাধারণ স্তরের দেবতাদেরও সে কী আস্ফালন! তাঁরা মহাবীর, তাঁদের বীরত্বের কাছেই অসুররা এমনভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে— এমনই ঘোষণা করে সব দেবতাই স্ফীতি বক্ষ। অতীতে বহুবার অসুরদের কাছে লেজেগোবরে হলেও এই এবারের জয়ের পর সেসব কথা ভুলে গেলেন দেবতারা। তাঁদের দম্ভ, বীরত্বের অহমিকার প্রকাশ দেখে মনে হতে পারে দেবতারা অজেয় এবং সেটা বরাবরই।

দেবতাদের এভাবে জয়ের জয়ঢাক বাজাতে দেখে ব্রহ্ম নিজের মনেই যেন একটু হাসলেন। তাঁর ইচ্ছাতেই যে দেবতাদের এই জয় সেটাই ভালো করে বোঝাতে তিনি অবতারণা করেন এক নতুন নাটকের। সেই নাটকের মূল উদ্দেশ্য দেবতাদের দম্ভের অবসান ঘটিয়ে আবার তাদের সত্যের পথে প্রতিষ্ঠা করা। মিথ্যা অহমিকা যে পতনের কারণ হতে পারে সেই কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই ব্রহ্মের এই উদ্যোগ। দেবতারা যাতে অতি দম্ভে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত না হন তারই জন্য সক্রিয় হলেন তিনি।

দেবতারা তখন উদ্দাম। দেবসুলভ সমস্ত সংযম বিসর্জন দিয়ে যুদ্ধজয়ের আনন্দে মত্ত তখন তাঁরা। এমন সময় অকস্মাৎ সংখ্যাহীন বিদ্যুৎ ঝলকের দারুণ দীপ্তিতে আলোকিত হয়ে ওঠে সেই স্থান। বিস্মিত হতচকিত দেবতারা দেবেন সেখানে আবির্ভূত হয়েছেন জ্যোতির্ময় এক যক্ষ। এ যক্ষ যে ব্রহ্মেরই একটি রূপ তা কল্পনাও করতে পারেন না দেবতারা। ব্রহ্মকে না জানার কারণেই সেই যক্ষের আবির্ভাবে ভীত হন দেবতারা। মুহূর্তে থেমে যায় তাঁদের সব উদ্দামতা। আমোদ- চিৎকার এবং ছন্দহীন নৃত্য। অহমিকার ঘন তমিস্রায় আঁধারঘন হৃদয় কেবল নয়, দৃষ্টিও স্বচ্ছ নয় দেবতাদের। আর সে কারণেই দৃষ্টিহীনের মতোই তাকিয়ে থাকেন তাঁরা সেই আলোকময় ব্রহ্মের দিকে।

তাঁদের অবস্থা দেখে হাসেন ব্রহ্ম। মনে মনে। এমনটা যে হবে তা তো তাঁর জানা। তিনি জানেন, এই ভয়ংকর অস্মিতাই সর্বনাশ করবে দেবতাদের। পথভ্রষ্টও করবে। এবং সে কারণেই আজ তাঁর আবির্ভাব সহস্র কোটি সূর্যের দীপ্তি নিয়ে।

সেই হিরন্ময় পুরুষের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারেন না দেবতারা। অদৃষ্টপূর্ব ওই আলোক-পুরুষের তেজ শুষে নিয়েছে তাঁদের সব বোধ-শক্তি। কেমন যেন এক অসহায়তার গভীরে ডুবতে থাকেন তাঁরা। সেই ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে ভেসে আসা খড়কুটো ধরার মতোই তাঁদের সমবেত জিজ্ঞাসা, কে ইনি? কী এর পরিচয়? কোন কারণেই বা তাঁর এই আবির্ভাব। নিজেদের মধ্যেই ক্ষণেকের ফিসফাস। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই তো জানা যাবে সব। কিন্তু যাবে কে? ওঁর কাছে যাওয়ার মুহূর্তেই তো ওই আলোর তেজে বিলীন হয়ে যেতে পারে সব। সেই মুহূর্তে বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে যাবে কোনো মূষিক— এমনই অবস্থা তাঁদের।

তারই মধ্যে সকলে মিলে ধরেন অগ্নিকে। বলেন, তুমি জাতবেদা অর্থাৎ সব কিছুই জানা তোমার। তুমি সর্বজ্ঞ। তুমিই নরলোক থেকে যজ্ঞভাগ হবি এনে দাও আমাদের। আমাদের মধ্যে তুমিই প্রধান এবং উপযুক্তও। তাই তুমিই যাও ওই মহান পুরুষের কাছে। জেনে এসো ওঁর পরিচয়। কত শক্তির অধিকারী তিনি তাও যাচাই করে নেবে ওই সঙ্গে।

অগ্নি দেবতা। কিন্তু তোষামোদে ভোলেন না এমন কেউ নেই এই ত্রিভুবনে। তাই দেবতাদের অনুরোধে তাঁর মধ্যেও জেগে ওঠে অহমিকা আরও তীব্রভাবে। ইন্দ্র দেবরাজ। কিন্তু এসব কাজে যে তিনিই পারঙ্গম এ কথা তো আজ মেনে নিলেন সমবেত দেবতারা। তাই দেরি নয়। এবার দেখাতে হবে তাঁর ক্ষমতা। বীরদর্পে এগিয়ে যান অগ্নি। কিন্তু ভুলে যান একটি শাশ্বত সত্য, বিনয়ীরাই জ্ঞানলাভের যোগ্য। মন থেকে জ্ঞানের অহংকার একবারে দূর করে শ্রদ্ধায় অবনত হতে পারলেই প্রকৃত জ্ঞান ও সত্য জানার উপযুক্ত পাত্রে পরিণত করা যায় নিজেকে।

পূর্ণকুম্ভ বুকের তলায় নিয়ে সাঁতার কাটা যায় না জলে। কলসীকে জলশূন্য করে শ্রদ্ধার সমীরণে ভরে জলে নামলে সেই কলসিই হয় কিন্তু সাঁতার কাটার সহায়ক। দেবতা হয়েও এই বোধের অভাবই শেষ পর্যন্ত অগ্নিকে করে ব্যর্থ। জানার ইচ্ছাটা তাঁরও জেগেছিল মনে, কিন্তু তাঁর অস্মিতা বোধই হয়ে ওঠে পাষাণ প্রাচীর তাঁর ওই জানার ক্ষেত্রে। প্রকৃতপক্ষে একরকম অন্ধ হয়েই তিনি গিয়ে দাঁড়ালেন যক্ষরূপী ব্রহ্মের সামনে।

তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে যক্ষই জিজ্ঞাসা করেন প্রথমে, কে তুমি? কী তোমার পরিচয়?

উদ্ধত ভঙ্গিতেই আসে জবাব, আমি অগ্নি। আমি জাতবেদা সর্বজ্ঞ আমি। এই রূপেই প্রসিদ্ধ আমি এই ত্রিভুবনে।

নিজেকে 'জাতবেদা' বলে অগ্নি যে অহংকার দেখালেন, সে কারণেই জাতবেদা হয়েও অগ্নি জানতে পারলেন না সৃষ্টির অতীত ব্রহ্মকে।

ইহজগতে মানুষেরও হয় সেই অবস্থা। ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিতে মানুষ যে জাগতিক জ্ঞান অর্জন করে তাতেই 'সবকিছু জেনে গেছি'— এমন অহংকারে একরকম জ্ঞানান্ধ হয়ে যায়। নিজেকে ওইভাবে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ বা সবজান্তা বলে মনে করার কারণেই ব্রহ্মকে মানুষ জানতে পারে না। বরং ক্রমশ দূরে চলে যায়। কিন্তু যে মুহূর্তে জ্ঞান ও শক্তির অহংকার বিসর্জন দিয়ে ব্রহ্মের শরণাপন্ন হয়, নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সমপূর্ণ করে তাঁর কাছে— তখন সেই অহং বোধহীন হৃদয়ই ভরে যায় ব্রহ্মকে জানার আনন্দের ইচ্ছায়। তখনই সেই মানুষ ব্রহ্মকে জানার যোগ্যতা অর্জন করে।

এই সহজ কথাটা বোঝা বড়ো সহজ নয়। মানুষ তো বটেই দেবতারাও এই একই পথের পথিক। তাঁরাও যে পরব্রহ্মের আলোয় আলোকিত, এই কথাটাই মাথায় থাকে না তাঁদের। আর তাই গ্রহণের মতোই অহমিকার রাহুগ্রাসের মুখে পড়তে হয় তাঁদেরও। ব্রহ্মর ইচ্ছা বা কৃপাতেই অবশ্য কেটে যায় গ্রহণের ওই অন্ধকার।

যাইহোক, অগ্নির ওই 'আমিই প্রসিদ্ধ', 'আমিই প্রসিদ্ধ' এই কথা শুনে তাঁর অহমিকা চূর্ণ করতেই যেন একটু ব্যঙ্গের হাসির বিদ্যুৎ ঝিলিক দেখা যায়। ব্রহ্ম বলেন, তাহলে তো দেখছি তুমি মহাশক্তিধর। তা কেমন শক্তি তোমার— তার একটু পরিচয় দাও তো বাপু? ব্রহ্মর কথার খোঁচাটি ধরতে পারেন না অগ্নি। তাই আগের মতোই গর্বিত সুরে বলেন, জগৎ-পাবক আমি। আমার প্রচণ্ড দাহিকা শক্তিতে আমি সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারি।

—বটে, বটে। এতো তোমার শক্তি! তা একটা ছোট্ট প্রমাণ দাও তো।

—বলুন, কী করতে হবে?

—বিশেষ কিছু নয়। এই যে এক গাছি শুকনো ঘাস দেখছো, এটাই শুধু পুড়িয়ে দাও তুমি।

—এই! এই সামান্য বিষয় নিয়ে কী পরীক্ষা নেবেন, অন্য কোনো পরীক্ষা নিন বরং।

—প্রয়োজন নেই! এটাই পোড়াও না কেন।

ফুঃ বলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন অগ্নি নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঘাসটা তো রয়েছে একই রকম। এবার একটু উত্তপ্ত দৃষ্টি— তারপর— আরও এবং সর্বশক্তি প্রয়োগ। তবু অবস্থার হয় না এতটুকু হেরফের। ঘাসটা রয়েছে একই রকম।

এক সময় হতাশ হয়েই হাল ছেড়ে দেন তিনি। কোনো কথা না বলে মাথা নীচু করে অগ্নি ফিরে আসেন দেবতাদের কাছে। হতাশ গলায় বলেন, ওই পূজনীয় স্বরূপের পরিচয় আমি জানতে পারিনি।

অগ্নিকে ব্যর্থ হতে দেখে, দেবতারা এবার বায়ুকে ধরেন। বলেন, আপনি তো সর্বত্রগামী। আপনি গিয়ে জেনে আসুন ওঁর পরিচয়।

অগ্নির মতোই গর্বোদ্ধত বায়ু। তাই আর কোনো না বলেই সোজা হাজির যক্ষর কাছে। তাঁকে দেখে যক্ষের যথারীতি সেই প্রশ্ন, কে তুমি?

অগ্নির মতো উদ্ধত কণ্ঠ বায়ু বলেন, আমিই প্রসিদ্ধ বায়ু। আমিই প্রসিদ্ধ মাতরিশ্বা। আমি সদা-চলনশীল এবং গন্ধ গ্রহণ করি বলেই আমি

বায়ু নামে প্রসিদ্ধ। অন্তরিক্ষেও আমি অবাধে বিচরণ করি বলে আমি 'মাতরিশ্বা' নামেও প্রসিদ্ধ।

ব্রহ্ম দেখেন, অগ্নির মতোই বায়ুও উদ্ধত এবং গর্বিত। তাই এরও গর্বচূর্ণ করা দরকার। গর্বশূন্য না করলে যে এর প্রকৃত জ্ঞানলাভ হবে না। তাই তিনি বলেন, ও, তুমিও একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

—হ্যাঁ। ত্রিজগতের সকলে জানে আমাকে।

—তা তোমার মহাশক্তি একটা নমুনা এবার দেখাও তো!

—বলুন কী করতে হবে।

ব্রহ্ম সেই একগাছি ঘাস সামনে রেখে বলেন, খুবই সামান্য ব্যাপার। এই ঘাসটাকে তুমি উড়িয়ে নিয়ে যাও।

বায়ু ভেবেছিলেন একটা বিরাট কিছু করতে হবে তাঁকে। তার পরিবর্তে সামান্য এক গাছি ঘাস উড়িয়ে নিয়ে যেতে কথায় আঁতে একটু ঘা লাগে বায়ুর। মনের সেই ভাব চেপেই তিনি একটা ফুৎকার দেন। দেখেন, ঘাস রয়েছে সেই একই জায়গায়। একটু কাঁপন ওঠেনি তাতে। বিস্মিত বায়ুর কিছুটা বোধোদয় হয়। বোঝেন, এই যক্ষ সাধারণ কেউ নয়। তাই আর হেলাফেলা নয়, সর্বশক্তি দিয়ে ঝড়ো তুফান তুললেন তিনি। কিন্তু ফল সেই ব্যর্থতা। অগ্নির মতোই নতমস্তকে ফিরে এলেন তিনি। বললেন, পারলাম না— পারলাম না ওই বিরাট পুরুষের স্বরূপ জানতে।

এইবার অন্য কাউকে নয়, সমবেত দেবতারা ইন্দ্রকেই বলেন, দেবরাজ, আপনিই আমাদের রাজা। আমাদের অধিপতি আপনি। তাই আপনিই এবার গিয়ে বরং যেন আসুন ওই যক্ষের পরিচয়।

ইন্দ্র রাজি হলেন এক কথাতেই। অগ্নি বা বায়ুর মতো উদ্ধত উচ্চশির হয়ে নয়, ইন্দ্র এগিয়ে গেলেন অবনত মস্তকে সেই যক্ষের দিকে দৃঢ় এবং কিছুটা বিনত ভঙ্গিতেই।

ইন্দ্র এনিয়ে যাচ্ছেন। দেবতারা সবিস্ময়ে দেখলেন, ইন্দ্র তাঁর কাছে যেতেই অন্তর্হিত হলেন সেই যক্ষ। তিনি ইন্দ্রকে কিছু জিজ্ঞাসা করারই কোনো সুযোগই দিলেন না। ফলে ইন্দ্র তো বটেই, দেবতাদের কাছেও সেই মুহূর্তে ওই যক্ষের পরিচয় অজ্ঞাতই থেকে গেল। অজ্ঞাত থাকল বলেই দেবতারা তখন হতচকিত আবার কিছুটা ভীতও।

ইন্দ্রও ভাবেন একই কথা। কেন এমন হলো? তাঁর দিক থেকে কি কোনো ত্রুটি ছিল? জ্ঞানত তো তিনি জিজ্ঞাসু মন নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর কাছে। নিজের সম্পর্কে কোনো বড়ো কথা বা গর্ব প্রকাশের বিন্দুমাত্র বাসনা তো ছিল না তাঁর। তাহলে কেন এমন হলো? অগ্নি, বায়ুকে তো তিনি কাছে আসতে দিয়েছিলেন, কথাও বলেছিলেন, দেখতে চেয়েছিলেন তাঁদের শক্তি। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে এমন ভিন্ন ব্যবহার কেন? তাহলে অগ্নি বা বায়ুর চেয়ে তিনি কি অযোগ্য? তাঁর কথা শোনার মতো যোগ্যতাও তাঁর নেই।

ইন্দ্র নিজের অযোগ্যতা বা দুর্ভাগ্য নিয়ে ভাবতে থাকেন সেখানে দাঁড়িয়েই। যক্ষকে অন্তর্হিত হতে দেখেও ফিরে গেলেন না তিনি। বরং আশা, যদি আবার দেখা দেন তিনি! যদি দেন পরিচয়। তাই আশায় আশায় ইন্দ্র তখন সেখানেই দাঁড়িয়ে।

শাস্ত্রকাররা মনে করেন, ইন্দ্রর সঙ্গে কোনো কথা না-বলে যক্ষরূপী ব্রহ্মের অন্তর্ধানের একটা কারণ রয়েছে। প্রথমত জ্ঞানগর্বী হয়ে নয়, প্রকৃত জিজ্ঞাসুর মতোই ইন্দ্র যাচ্ছিলাম যক্ষের কাছে। তাঁর মধ্যে দর্পের চিহ্নমাত্র ছিল না। এই তাঁর দর্পচূর্ণ করার কোনো প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু কেবল জিজ্ঞাসুর বা বিনম্র-দর্পশূন্য হলেইতো হয় না, নির্মল বিবেক বুদ্ধি বা প্রকৃত বিদ্যার উদয় না হলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। তাই ব্রহ্ম নিজে অন্তর্হিত হয়েও ইন্দ্রের হৃদয় নির্মল করার জন্য সেখানে পাঠিয়ে ছিলেন উমা রূপে ব্রহ্মবিদ্যাকে। তাঁরই প্রসাদে ইন্দ্র হলেন বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন নির্মল হৃদয়।

ইন্দ্র সেই আকাশেই বহু শোভান্বিতা নানা স্বর্ণালংকার ভূষিতা হৈমবতীকে দর্শন করলেন। তাঁকে দেখে প্রণত ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, কৃপা করে বলবেন কী, ওই জ্যোতির্ময় যক্ষ যিনি এতক্ষণ এখানে থাকলেও আমি কাছে আসতেই অন্তর্হিত হলেন, তিনি কে?

ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী হৈমবতী উমা বলেন, উনিই ব্রহ্ম। ওঁর ইচ্ছায় তোমরা অসুরবিজয়ী হয়েছো। অথচ সেটা না বুঝে আত্মগর্বে স্ফীত হয়েছে তোমরা। তোমাদের সেই দম্ভনাশ এবং প্রকৃত কথাটা জানাবার জন্যই যক্ষ রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বয়ং ব্রহ্ম। কিন্তু অগ্নি এবং বায়ু তাঁদের অস্মিতার কারণেই জানতে পারেননি তাঁকে। নির্মল চিত্তে প্রকৃত জিজ্ঞাসু হয়ে তাঁতে তন্ময় থাকলেই কৃপা করে দর্শন দিতে পারেন তিনি কোনো এক শুভক্ষণে। শুধু জেনো প্রকৃত কারণ তিনি, বাকি সকলেই নিমিত্ত মাত্র। তিনি ইচ্ছা করলেই তোমাদের পরিবর্তে অসুরদেরও জয়ী করতে পারতেন। সে কারণে, কোনো সময়ে কোনো কিছুর জন্যই গর্ব করতে নেই। তিনিই একমাত্র সত্য। কর্তাও তিনিই। সবকিছুই করেন তিনি তারই লীলারঙ্গে। তাই দেবতা হও, মানুষ হও অথবা হও অন্যকিছু, কোনো সময়ই কোনো কাজের জন্যই নিজেকে কর্তা ভাববে না। দর্পে শূন্যে ভাসবে না। জানবে সেটা অজ্ঞতা। আর অজ্ঞানীরা কোনো সময়ই পান না ব্রহ্ম সাযুজ্য। হতে পারেন না ব্রহ্মময়। ফলে জন্মান্তরের চক্রে আবর্তিত হতে হয় অনুক্ষণ বারংবার।

কেন উপনিষদের এই আখ্যায়িকার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সনাতন ধর্মের বিশেষত্ব এবং লক্ষ্যকে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরা প্রেত্যাস্মাল্লাকামাদৃতা ভবন্তি'— জ্ঞানীরা সর্বভূতেই পরমাত্মাকে উপলব্ধি করে এই মরজীবনের সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে অমৃতত্ব লাভ করেন।

সনাতন ধর্মের সারকথা, ব্রহ্মকে সম্যকভাবে জানতে পারলেই হয় ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি। তখনই অমৃতময়, আনন্দময়, মুক্ত স্বাধীন জীবন লাভ করা যায়। সেটাই মানব জীবনের পরমপুরুষার্থ।

সনাতন ধর্মকে যাঁরা আত্মসর্বস্ব স্বার্থপরের ধর্ম বলে প্রচার করেন বা করতে চান, তাঁরা এই ধর্মের বিশালতা এবং মর্মকথা হয় সঠিক ভাবে জানেন না অথবা বিকৃতভাবে পরিবেশন করে নিজেরা একরকম আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান। নাহলে তাঁরা বলতে বাধ্য হতেন, সনাতন ধর্মের লক্ষ্য ব্রহ্ম লাভ। সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার অন্যতম সোপান সর্বভূতে অর্থাৎ এই জীব ও জড় জগতের সবকিছুতেই ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা এবং সেই উপলব্ধি থেকেই আত্মজ্ঞানেই সব কিছুর সেবা করার মহান আদর্শের কথা বলা হয়েছে। নিজের মধ্যে রয়েছে যে আত্মা বা ব্রহ্ম সবকিছুর মধ্যেই তাঁকে দর্শন করে, তাঁর সেবা করে পাওয়া যায় নিজেকে সেবা করারই আনন্দ। এই উদারতার কথাতেই বেদ থেকে শুরু করে সর্বত্র বলা হয়েছে সকলের সঙ্গে সব কিছু ভাগ করে নেওয়ার কথা। বলা হয়েছে, 'যে ধনবান লোক পরকে পতিপালন করে না তাকে আমি ঘৃণা করি' (ঋগ্বেদ ১।১২০।১২)। সব কিছুর মধ্যেই ব্রহ্মকে দর্শন করে স্মরণে মননে, সেবা ও শুশ্রূষায় জীবন পাতেরই অন্য নাম সনাতন ধর্ম। ☐

তন্ত্রসাধনা গুহ্য ও গুরুমুখী বিদ্যা

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

বৌদ্ধ দেবমণ্ডলের আদি দেবতা হলেন আদিবুদ্ধ। ইনি শূন্যস্বরূপ বা বজ্র। আদিবুদ্ধ যখন দেবতার আকারে আসেন তখন তাঁর নাম বজ্রধর। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের শেষে আবির্ভূত পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের ধারণায় ধ্যানীবুদ্ধ হলেন পাঁচজন— বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। প্রত্যেকের গাত্রবর্ণ আলাদা, মুদ্রা আলাদা। এঁরা প্রতেকে এক-একটি কুল এবং এদের কুলের অন্তর্গত একরাশ দেবতা আছেন। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের শক্তি হলেন যথাক্রমে— মামকী, পাণ্ডরা, তারা, লোচনা ও বজ্রধাত্রীশ্বরী। এছাড়া বজ্রসত্ত্ব নামে আরও একজন ধ্যানীবুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর শক্তি হলেন বজ্রসত্ত্বাত্মিকা। প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধের নিজস্ব বোধিসত্ত্ব আছেন। তাঁরা হলেন বজ্রপাণি, পদ্মপাণি, বিশ্বপাণি, সমন্তভদ্র ও রত্নপাণি। বজ্রসত্ত্বের বোধিসত্ত্ব হলেন ঘণ্টাপাণি। এই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ আবার পাঁচটি স্কন্দের বা কুলের অধিষ্ঠাতা। এই পাঁচটি কুল হলো দ্বেষকুল, মোহকুল, রাগকুল, চিন্তামণিকুল ও সময়কুল। যাঁরা এই কুলের পূজাপদ্ধতি মেনে চলেন তাঁদের বলা হয় কৌল। পূজাপদ্ধতির নাম কুলাচার। মহাচীন বা তিব্বতের মতো তারাপীঠে আজও এই কৌলপ্রথা, কুলাচার বা মহাচীনাচারের প্রচলন আছে। এই প্রসঙ্গে তন্ত্রবিষয়ে একটি কথা জেনে রাখা ভালো যে, শাক্তসম্প্রদায় মূলত দুটি কুলে বিভক্ত— কালীকুল ও শ্রীকুল। এই দুই কুলের দেবী দুই প্রকারের। কালীকুলের দেবীরা হলেন কালী, তারা, রক্তকালী, ভুবনেশ্বরী, মহিষমর্দিনী, ত্রিপুটা, ত্বরিতা, দুর্গা ও বিদ্যা প্রত্যাঙ্গিরা। অপরদিকে শ্রীকুলের দেবীরা হলেন ত্রিপুরাসুন্দরী, ললিতা বা ষোড়শী, ভৈরবী, বালা, বগলা, কমলা ধূমাবতী, মাতঙ্গী, বিদ্যা স্বপ্নাবতী ও মহাবিদ্যা মধুমতী।

নিরুক্ত তন্ত্রানুযায়ী—

কালিতারা রক্তকালী ভুবনা মহিষমর্দিনী
ত্রিপুটা ত্বরিতা দুর্গা বিদ্যা প্রত্যাঙ্গিরা তথা।
কালীকুলং সমাখ্যাতং শ্রীকুলঞ্চ ততঃপরম্
সুন্দরী ভৈরবী বালা কমলাপি চ
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী বিদ্যা স্বপ্নাবতী প্রিয়ে
মধুমতী মহাবিদ্যা শ্রীকুলং পরিভাষিতম্।।

শাক্তদের মধ্যে দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের নাম পশ্বাচারী ও বীরাচারী। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ হলো বীরাচারে পঞ্চ ম-কারের সাধনার প্রচলন আছে, পশ্বাচারে তা নেই। কুলার্ণবতন্ত্রে এই দুই প্রকার আচারকে আবার সাতভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে বেদাচার উত্তম (এই বেদাচারের সঙ্গে বৈদিক আচারের কোনো সম্পর্ক নেই)। বেদাচার অপেক্ষা বৈষ্ণবাচার উত্তম। বৈষ্ণবাচার অপেক্ষা শৈবাচার উত্তম। শৈবাচার অপেক্ষা দক্ষিণাচার উত্তম। দক্ষিণাচার অপেক্ষা বামাচার উত্তম। বামাচার অপেক্ষা সিদ্ধান্তাচার উত্তম। সিদ্ধান্তাচার অপেক্ষা কৌলাচার উত্তম। কৌলাচার অপেক্ষা উত্তম আর কিছু নেই (রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে পতিত হবি কুল ছাড়িলে/মন ভুলো না কথার ছলে)। এই কুলাচার বা কৌলাচার প্রথাটি তিব্বতীয় বৌদ্ধতন্ত্র বা মহাচীনাচারতন্ত্র জাত।

সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক ঋষি হলেন মহর্ষি বশিষ্ঠ। তাঁর আরাধ্যা দেবী হলেন মা তারা। তিনি দক্ষিণাচারী পরম্পরার সাধক। মা তারার নির্দেশে সাধনা সম্পূর্ণ করা লক্ষ্যে পঞ্চ ম-কার সাধনার উদ্দেশে তিনি তিব্বত বা মহাচীনে গমন করেন। সেখানে স্বয়ং মহাবিষ্ণুর সান্নিধ্যে তিনি বামাচারে সিদ্ধিলাভ করেন। ঋষি বশিষ্ঠ হলেন শ্রীরামচন্দ্রের পরমারাধ্য গুরুদেব।

পঞ্চ ম-কার ছাড়া সাধকের মহাতন্ত্র সাধনা কখনোও সফল হয় না। কারণ মহাশক্তিরূপিনী দেবীগণের আরাধনায় শক্তিকে জাগ্রত করতে হলে পঞ্চ ম-কারের বিশেষ প্রয়োজন হয়। মহাতন্ত্র সধানার ক্ষেত্রে কোনোমতেই পঞ্চ ম-কারকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। পঞ্চ ম-কার হলো মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন।

এই পঞ্চ ম-কার আসলে কী? ভগবান শঙ্কর মহাদেবীকে পঞ্চতত্ত্ব সম্পর্কে বলছেন, তেজ হলো আদিতত্ত্ব। পবন হলো দ্বিতীয় তত্ত্ব। জল হলো তৃতীয় তত্ত্ব। পৃথিবী হলো চতুর্থ তত্ত্ব। এই জগদাধার অন্তরীক্ষই হলো পঞ্চম তত্ত্ব।

পঞ্চ ম-কার সাধনার ক্ষেত্রে সাধনপ্রণালীর বিষেয়ে আগমসার তন্ত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

মদ্য ঃ সাধনা চলাকালীন সাধকের ব্রহ্মরন্ধ্র হতে ক্ষরিত সোমধারাকে মদ্য বলা হয়।

মাংস ঃ মা অর্থে রসনা। রসনার অংশ বাক্য ও বাসনা। যিনি তা ভক্ষণ করতে পারেন তাঁকেই মাংস সাধক বলা হয়।

মৎস্য ঃ ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্য দিয়ে যে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহিত হয় তন্ত্রশাস্ত্রে তাকে মৎস্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি তা ভক্ষণ করেন অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণকে স্থির করতে পারেন তিনিই মৎস্য সাধক।

মুদ্রা ঃ সাধকের মস্তিষ্কস্থ সহস্রদল মধ্যস্থিত পারদের মতো শুভ্রবর্ণ পদার্থকে মুদ্রা বলা হয়েছে। কোটি সূর্য-চন্দ্রের আভা অপেক্ষা যার অধিক প্রকাশ, অথচ শীতল আভাযুক্ত, কমনীয় এবং এই মহাকুণ্ডলিনী সংযুক্ত যে মহানক্ষত্রস্বরূপ আত্মা অবস্থা করছেন, তাঁকে যিনি জেনেছেন ও উপলব্ধি করেছেন তিনিই মুদ্রা সাধক।

মৈথুন ঃ সাধনার দ্বারা বদ্ধ জীবাত্মাকে মুক্ত করে পরমাত্মার সঙ্গে মহামিলনকে মৈথুন হলা হয়। এই স্তরে ব্রহ্মাণ্ডের মহাশূন্য সত্তার সঙ্গে সাধকের শূন্য সত্তার মিলন ঘটে, সাধকের স্বীয় সত্তার সম্পূর্ণ লয় হয়ে সাধকের নির্বিকল্প মহাসমাধি প্রাপ্তি হয়।

তন্ত্রে সব কিছুই গোপন। ইহা এক গুহ্য ও গুরুমুখী বিদ্যা। ☐

বউবাজারে মলঙ্গা লেনে গোপাল মুখার্জির দুর্গাপুজোর থিম শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধন।

বাঙ্গলার রাম বাঙ্গালির রাম

রবিব্রত ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা, যারা রাজ্যের অ্যাসেট নাকি লায়াবিলিটি, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। পড়াশোনা আরও কম যা ছিল সব তাদের রাজনৈতিক প্রভুর পদতলে রেখেছেন। রাম নাকি এই বঙ্গপ্রদেশে বহিরাগত! প্রাচীন এবং মধ্যযুগে বাঙ্গলায় রামের কোনো অস্তিত্বই নাকি তারা খুঁজে পেলেন না। একটা সংকটের সময় এই রকমের কথা বলতে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের বুদ্ধি, বিবেচনা, পড়াশোনা নিয়ে অনেক আগেই প্রশ্ন তোলা উচিত ছিল। সাধারণ বাঙ্গালি কেন প্রশ্ন তোলেনি এটা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। আসলে রামকথা বিকাশের ধারাটা বড়ো অদ্ভুত। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ করা কঠিন বাল্মীকির রচনাকাল। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায় এই কাব্যটি অসম্ভব জনপ্রিয় এবং তা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রকম ভাবে অনূদিত হতে হতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

গবেষকদের মতে, রাম এবং রামায়ণ এই ভারতভূমি থেকে এশিয়ার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে মূলত দুটি স্থলপথ এবং একটি জলপথ ধরে। পঞ্জাব, কাশ্মীর হয়ে উত্তরাভিমুখে স্থলপথে রামের কথা পৌঁছয় চীন, তিব্বত ও পূর্ব তুর্কিস্থানে। এই সূত্রটির বিস্তার মূলত বৌদ্ধধর্মের হাত ধরে। অন্য স্থলপথটি, বঙ্গদেশ থেকে পূর্বাভিমুখী হয়ে মায়ানমার, তাইল্যান্ড, লাও, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামে। আর জলপথের মাধ্যমে রামকথা গুজরাট এবং দক্ষিণ ভারত থেকে পৌঁছয় জাভা, সুমাত্রা, যবদ্বীপ অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়া-সহ 'দ্বীপময় ভারতে'। আসলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের একটি সময় রামকেন্দ্রিক ধারণাটি পরতে পরতে জড়িয়ে গিয়েছিল। যা শুধুমাত্র ভারত নয় ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গেও একটা সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিল। আমরা খেয়াল করলে দেখব রামায়ণে প্রাচীন বঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমেই বলি বাল্মীকি রামায়ণে কিন্তু বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বলা হয়েছে :

যাবদাবর্ততে চক্রং তাবতী বসুন্ধরা।।
দ্রাবিড়াঃ সিন্ধুসৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গমগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোসলাঃ।।
তত্র জাতং বহু দ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃণীষু কৈকেয়ি যদ যৎ ত্বং মনসেচ্ছসি।।
(রামায়ণ : অযোধ্যা, ১০.৩৬-৩৮)

ফঃ ৫

‘দ্রাবিড়দেশ, সিন্ধু-সৌবীর দেশ, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, বঙ্গদেশ, অঙ্গদেশ, মগধ ও মৎস্যদেশ, কাশী, কোশল— এই সকল সমৃদ্ধ দেশ, যতদূর পর্যন্ত সৌরচক্র আবর্তিত হচ্ছে ততদূর পর্যন্ত এই বসুন্ধরা আমার অধীন; সেই সকল স্থানে জাত ধন-ধান্য, ছাগ-মেষ, সকলই আমার অধীনে। হে কৌকেয়ি! তুমি মনে মনে যা ইচ্ছা কর, তা আমার থেকে চেয়ে নাও।

বাঙ্গলার বিখ্যাত পাল রাজবংশের রাজা রামপালকে নিয়ে সন্ধ্যাকর নন্দী (আনুমানিক ১০৮৪-১১৫৫)। ‘রামচরিতম্’ নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেন। অনেকেই মনে করেন এই বইটি রামচন্দ্রকে নিয়ে বাঙ্গলায় রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থের উদাহরণ। সংস্কৃত ভাষায় রচিত এটি একটি দ্ব্যর্থবোধক কাব্য। অর্থাৎ প্রত্যেকটি শ্লোকের দুটি করে অর্থ প্রদান করে। চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই কাব্যে একই সঙ্গে দশরথপুত্র রামচন্দ্রের এবং গৌড়েশ্বর রামপালের চরিতকথা বর্ণিত হয়েছে। জীবনচরিতমূলক ঐতিহাসিক কাব্য হিসেবে গণ্য হলেও ‘রামচরিতম্’ গ্রন্থটিই কোনো বাঙ্গালির লেখা সম্ভবত প্রথম রামচরিতকথা।

তবে বাঙ্গলায় শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ কৃত্তিবাসের বাংলায় লেখা কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়লে মনে হবে, শ্রীরামচন্দ্র বুঝি বাঙ্গালি ছিলেন। কৃত্তিবাস যখন রামায়ণ লিখেছেন, তখন বাঙ্গালি সংস্কৃতির উপরে শ্রীরামকে প্রতিস্থাপন করেছেন। এর জন্য মূল বাল্মীকি রামায়ণ থেকে অনেক জায়গাতেই সরে এসে অন্য সূত্রকে কাজে লাগিয়েছেন। একেবারে শুরুর কথাটাই বলা যাক। কেন রামায়ণ বা রামকথা লেখা হচ্ছে এই কথা বলতে গিয়ে বাল্মীকি রামায়ণে বলা হয়েছে ব্রহ্মার বাল্মীকির প্রতি নির্দেশ :

‘কুরু রামকথাং পুণ্যাং শ্লোকবদ্ধাং মনোরমাম।
যাবৎ স্থাস্যক্তি গিরয়ঃ সবিতশ্চ মহীতলে।।
তাবদ্রামায়ণ কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি।
যাব দ্রামস্য চ কথা ত্বকৃতা প্রচরিষ্যতি।।
তাবদূর্ধ্বমধমশ্চ ত্বং মল্লোকেষু বিবৎস্যসি।
ইত্যুক্তা ভগবান ব্রহ্মা তত্ত্বৈবান্তরধীয়ত!’

কৃত্তিবাস কিন্তু এই জায়গা থেকে সরে এসে অধ্যাত্ম রামায়ণের আশ্রয় নিয়েছেন। অধ্যাত্ম-রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের অনুসরণে কৃত্তিবাস সেই বাল্মীকির মধ্যে দেখেছেন দস্যু রত্নাকরের প্রায়শ্চিত্ত :

‘নিকটে আসিয়া ব্রহ্মা বলে তার কানে।
একবার রাম-নাম বল রে বদনে।।
মরা মরা বলিতে আইল রাম নাম।
পাইল সকল পাপে দস্যু-পরিত্রাণ।।
নামের মহিমা দেখি ব্রহ্মার তরাস।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।’

আরও দেখা যায় লঙ্কাকাণ্ডে মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে রাম-লক্ষ্মণের মূর্চ্ছিত হবার পর হনুমানের ওষুধ আনার ঘটনা-বিবরণে কবির স্বীকারোক্তি : ‘নাহিক এসব কথা বাল্মীকি রচনে। বিস্তারিয়া লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে।।’ উত্তরাকাণ্ডে লব-কুশের হাতে ভরত, শত্রুঘ্ন, লক্ষ্মণের পরাজয়, মূর্ছা এবং বাল্মীকির প্রসাদে পুনর্জীবনলাভের প্রসঙ্গটি যোজনার ক্ষেত্রেও তাঁর মন্তব্য : ‘এসব গাহিল গীত জৈমিনি ভারতে’। কৃত্তিবাস বাল্মীকি রামায়ণের যে সমস্ত অংশগুলি বাদ দিয়েছেন, তার মধ্যে প্রধান যথা— কার্তিকের জন্ম, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ, বিশ্বামিত্র কথা, অম্বরীশ যজ্ঞ, রামচন্দ্রের আদিত্য-হৃদয়ে স্তবপাঠ ইত্যাদি। এছাড়াও আছে বনবাসের যাত্রার সময় দশরথের প্রতি লক্ষ্মণের রূঢ় ব্যবহার, বনবাসের উদ্যোগে ভরতের সম্পর্কে সীতার কাছে রামের উষ্ণ মন্তব্য, লঙ্কাকাণ্ডে যুদ্ধের পর রাম ও সীতার পারস্পরিক তিক্ত বাক্য বিনিময় প্রভৃতি।

আবার বেশ কিছু অংশকে তিনি নিজের লেখার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছিলেন। বাল্মীকি রামায়ণের অনুক্ত অংশগুলি হলো : রত্নাকর পালা, সৌদাস-দিলীপ-রঘুর কাহিনি, দশরথের রাজ্যে শনির দৃষ্টি, গণেশের জন্ম, সম্বরাসুর বধ, কৈকেয়ীর বরলাভ, গুহকের সঙ্গে মিতালি, হনুমানের সূর্যকে ধারণ, অহিরাবণ-মহীরাবণ-তরণীসেন-বীরবাহু বৃত্তান্ত, অকালবোধন, গণকের ছদ্মবেশে হনুমানের রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ, মুমূর্ষ রাবণের কাছে রামের রাজনীতি শিক্ষা, খড়ি দিয়ে রাবণের মূর্তি আঁকার জন্য সীতার প্রতি রামের মনে সন্দেহ জাগরণ ও নির্বাসন দান ইত্যাদি ঘটনাসমূহ।

বাঙ্গালি মননের দাবিটাকে বুঝতে পেরে কৃত্তিবাস মনের মতো নিজের কাব্যটিকে সংযোজন বিয়োজন করতে পেরেছিলেন বলেই এটি অন্য মাত্রা পেয়ে দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ধনীর প্রাসাদ থেকে মুদির দোকান পর্যন্ত সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনেও বাঙ্গালি কৃত্তিবাসী রামায়ণকে ভোলেনি। কবির গৌরব মহাকালের কষ্টিপাথরে খাঁটি সোনার মতো সমুজ্জ্বল। সমাজের সবস্তরে বাঙ্গালির হৃদয়ে এত শ্রদ্ধা, গৌরব ও সহমর্মিতা খুব কম কবিই লাভ করতে পেরেছেন। সমগ্র বঙ্গভূমির সঙ্গে তিনি সংস্কৃত রামায়ণের যথাযথ পরিণয় সাধনে সার্থক। রামকথাকে তিনি বাঙ্গলার কোমল মাধুর্যে, সহজ লাবণ্যে, ভক্তির সৌরভে শোধন করে একান্তভাবে বাঙ্গালির প্রাণের কথারূপে প্রচার করেছেন।

কৃত্তিবাসের কাব্যে বাঙ্গালির গৃহজীবনের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট। এর মধ্যে সীতামাতা দেবর লক্ষ্মণের সঙ্গে রসিকতা করেন; সীতা মুনিপত্নীদের সম্মুখে স্বামীর নাম উচ্চারণ করেন না। কৃত্তিবাসের সীতা বঙ্গজীবনের আদর্শে চিত্রিত। কৃত্তিবাসের শ্রীরামচন্দ্র বঙ্গযুবকের মতো কোমল ও ক্রন্দনপরায়ণ। বাঙ্গলার মানুষের কাছে সর্বযুগে বাল্মীকিসৃষ্ট রামচন্দ্র অপেক্ষা কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র অনেক বেশি আপনার। কৃত্তিবাসের কাব্যে ফল্গুধারায় সর্বব্যাপ্ত এক ভক্তির ভাগীরথী প্রবাহ।

কবি-শিল্পীর সমগ্র দৃষ্টির অভাব ও ভক্তিবোধের অতিভাবে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও বাল্মীকির মহিমা অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। সারা কাব্যে দেখা যায় ভক্তির অসম্ভব ক্ষমতায় ভক্তির ভারসাম্য যেন কেঁপে গেছে— রামভক্তের সাজ পরে তরণীর কাটামুণ্ড ‘রামনাম’ উচ্চারণে, পিতা বিভীষণের রামচন্দ্রকে পুত্রের বধোপায়-নির্দেশে, যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণের স্তুতিতে রামের ব্যাকুলতা— ‘কেমনে এমন ভক্তে করিব সংহার। বিশ্বে কেহ রাম নাম না লইবে আর।’ কৃত্তিবাসের কাব্যে ভক্তি ব্যক্তিগত এবং যুগগত প্রয়োজনবোধে উদ্ভূত নিশ্চয়ই,

অধ্যাত্মময় রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণের প্রেরণাও হয়তো ছিল, তবু মনে হয় কবিমনের আবেগময়তায় অনেক সময় রসানৌচিত্যদোষ ঘটেছে।। এই কাব্যের মধ্য দিয়ে ভক্তিভাবনার যে প্রচ্ছন্নধারা প্রবাহিত তা শাক্ত-বৈষ্ণবের যুগল-সম্মিলনে অভিষিক্ত। বাল্মীকির রামায়ণে শক্তি-ভক্তি অনুপস্থিত। সেখানে বৈষ্ণবভক্তির প্রতি প্রবণতাই যেন অধিক বলে অনুভূত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে একদিকে নামাশ্রয়ী ভক্তি, অপরদিকে পরাৎপরা আদ্যাশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। 'রাম-শ্যামার মায়ামন্ত্রে' যেন পুলকিত এ কাব্যের বীণাযন্ত্র। এ নামের এমনই মহিমা—

'রামে মার শব্দ করে মরেছে রাক্ষস।
রাম নাম করে মরে গেছে স্বর্গবাস।।'

তাই, 'ভবসিন্ধু তরিবারে রামনাম ভেলায়' আশ্রয় নেবার জন্য কবি পাঠককে উপদেশ দিয়েছেন। এই নামতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল হনুমানের দাস্যভক্তি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কৃত্তিবাসের রাম ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। তিনি গুহক চণ্ডালকে মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করেন। বিনয়, নম্রতা, দুয়ার জীবন্ত বিগ্রহ রামচন্দ্র। কৃত্তিবাসের সীতা ও রামচন্দ্র বাঙ্গালির বড়ো প্রিয়জন, আত্মীয় অপেক্ষাও আত্মীয়।'

কৃত্তিবাস পুরাণ অনুবাদের মাধ্যমে বাঙ্গালির জীবন-রস পরিবেশন করেছেন। বাঙ্গালি জীবনের কালনিরপেক্ষ সর্বকালীন ভাবসুন্দর রূপটি এই কাব্যে পাওয়া যায়। পিতৃভক্তি, ভ্রাতার প্রতি স্নেহ, পাতিব্রত্য, ন্যায়-বোধ ইত্যাদির দ্বারা কবি বঙ্গ-গৃহস্থের রূপ অঙ্কন করেছেন। বাঙ্গালির জীবন-জীবিকা, নিসর্গ-প্রকৃতি, আচার-প্রথা, বেশভূষা ও রীতিনীতি সমকালীন অন্য কোনো কবির কাব্যে এভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালি জাতির 'হৃৎপদ্মসম্ভব' ও 'হৃদ্‌পদ্মবাসী'। জাতীয় জীবনের কথা যেমন রামায়ণে ঠাঁই পেয়েছে, তেমনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ জাতীয় জীবনকেও প্রভাবিত করেছে। কৃত্তিবাসের রচনার মধ্যে রয়েছে বঙ্গজীবনের সমাজ-সংসার ও প্রকৃতিভুবনের চিত্রকল্প। তাই বাঙ্গালি জীবনের আহার-বিহার, আনন্দ-বেদনা, ভক্তি-মুক্তি বাঙ্গালির ভাব ও ভাবনায় রচিত কৃত্তিবাসের রামায়ণী কথা চিরকাল প্রাণের কাব্য।

আবার শুরুর কথাটিতে ফিরে যাই। বাঙ্গলায় রামের অনেক বেশি বাঙ্গালীকরণ হয়েছে। এখানে কৃত্তিবাসের রাম ভক্তিরসে জারিত যে। জীবকে উদ্ধার করতে কাতর। এই রাম পারিবারিক রাম। সঙ্গে রয়েছেন ভাই, নিজের স্ত্রী। তাঁদের নিয়ে তিনি চলেছেন পিতৃসত্য রক্ষা করতে।

বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে তাঁর রামকথায় অনেক কিছুই সংযোজন বিয়োজন করেছেন। রামকথাকে তিনি বাঙ্গলার কোমল মাধুর্যে, সহজ লাবণ্যে, ভক্তির সৌরভে শোধন করে একান্তভাবে বাঙ্গালির প্রাণের কথারূপে প্রচার করেছেন।

আর একজন কবি অভিনন্দ। নবম শতকের সংস্কৃত পণ্ডিত ও কবি। তিনি দেবপাল বা হরবর্ষের সভাকবি ছিলেন। চল্লিশ সর্গের 'রামচরিত' গৌড়ভূমিতেই রচনা করেন। মনসামঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ

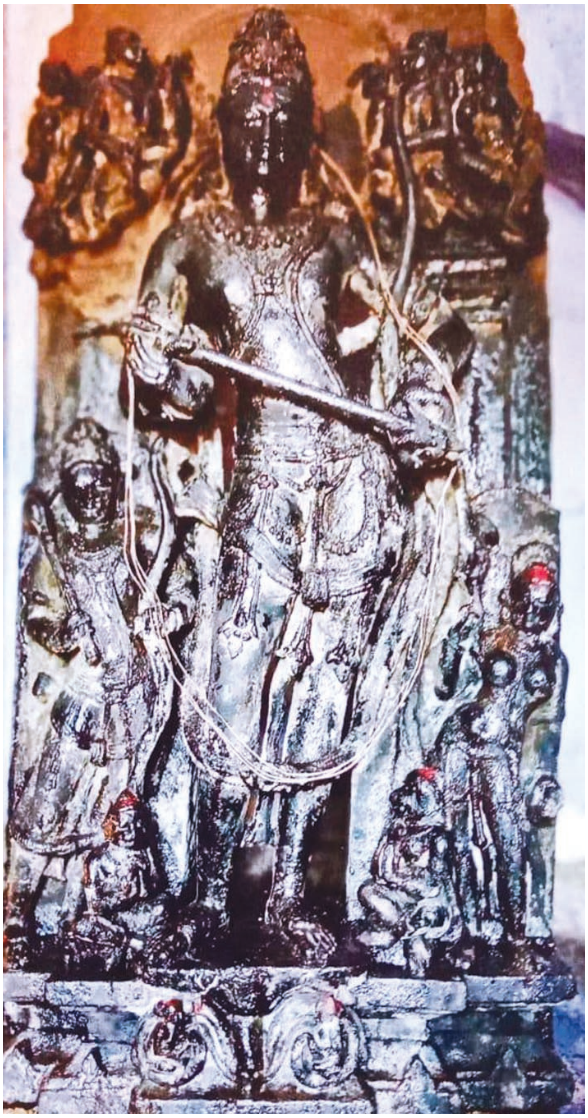

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে কাদাকুলির ৩ নম্বর ওয়ার্ডে প্রাচীন শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ।

বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী রচনা করেন রামায়ণ পালা। ১২৯৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় সৌদামিনী দেবীর 'অদ্ভূত রামায়ণ'।

কাশীরাম দাস যখন বাংলায় মহাভারত রচনা করছেন, ঠিক সেই সময়ে কবি জগতরাম রায় আরেকখানি রামায়ণ রচনা করছেন, বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামে বসে। রামায়ণ রচনা শেষে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা নিয়ে 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' নামে একটি খণ্ডকাব্যও রচনা করেন, দুর্গাপূজার প্রতিটি দিনের পৃথক বর্ণনা-সহ। এতগুলো সাহিত্য কীর্তি রামচন্দ্রের জনপ্রিয়তার কথাই প্রমাণ করে। এর বাইরে বাঙ্গলায় অসংখ্য রামমন্দির পাওয়া যাবে। অনেক মন্দিরগাত্রেই রামচন্দ্রের জীবনের ঘটনাকে নিয়ে অনেক স্থাপত্য পাওয়া যাবে। অনেক জায়গাতেই রামনামের ব্যবহার দেখা যায়। রাষ্ট্রচেতনাহীন বাঙ্গালি গর্ব করে বলে রাম বহিরাগত, বাঙ্গলার রাম রামমোহন। ভুলে যায় রামমোহনের প্রথম দুটি অক্ষর রাম। এর বাইরেও রাম নামে ভূত তাড়ানোর মতো প্রাচীন প্রবাদগুলো প্রমাণ করে রাম যথেষ্টই সমাদৃত ছিলেন এই বঙ্গভূমে। □

ডেমোক্র্যাসি ইটার্স অব বেঙ্গল

সুপ্রভাত বটব্যাল

আশি বছর আগে জিম করবেট দেখেছিলেন 'ম্যান ইটার অব কুমায়ুন।' এবারের পঞ্চায়েত ভোটে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখেছেন 'ব্যালেট ইটার অব বেঙ্গল'। তৃণমূলের যে প্রার্থী জেতার মরিয়া চেষ্টায় বিরোধীদের পক্ষে যাওয়া ব্যালট চিবিয়ে খেয়ে নিয়েছেন তিনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট ব্যঙ্গবিদ্রূপের লক্ষ্যবস্তু হয়েছেন। ঘটনাটি বিচিত্র এবং দুষ্কর্মের প্রকৃতিতে হাস্যকর উপাদান থাকায় তিনি মিডিয়া এবং সামাজিক মাধ্যমে বিখ্যাত হয়েছেন। কিন্তু ভেবে দেখলে পঞ্চায়েত ভোটকে ঘিরে উন্মত্ত হিংসার অভিযানের তুলনায় তাঁর অপরাধ অনেক লঘু।

মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, হিংসা তেমন কিছুই হয়নি। বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা মাত্র ঘটেছে। শুধু যে মৃত্যুর সংখ্যা তিনি হিসেব করেছেন তা নয়, এই ভোটকে তিনি একটি স্বাভাবিক ভোট বলে চিত্রায়িত করেছেন। অথচ দিন যত যাচ্ছে তত আরও স্পষ্ট সংবাদ আসছে কীভাবে ধাপে ধাপে এই নির্বাচনে জনগণের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন চলাকালীন চোখের সামনে যা দেখা গেছে, এখন বোঝা যাচ্ছে তার পিছনে পরিকল্পনা ছিল আরও ভয়াবহ। মনোনয়ন আটকাতে না পারলে প্রার্থী তোলানো, তা না পারলে বুথ দখল, তা-ও না পারলে ভুয়ো ব্যালট, সব কিছুর পরে গণনাকেন্দ্র ঘিরে রেখে লুট। 'কারচুপি' শব্দটি এখানে প্রযোজ্য না, কেননা কোনও গোপনীয়তার আশ্রয় নেওয়া হয়নি। প্রকাশ্যে লুট হয়েছে মানুষের দেওয়া রায়।

গণনা হয়েছে ১১ জুলাই। ২২ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যের নর্দমায়, পুকুরে, মাঠে, আবর্জনার স্তূপে ব্যালট পাওয়া যাচ্ছে। এত হাজার হাজার ব্যালট ফেলে দেওয়া হয়েছে যে পুড়িয়েও শেষ করা যাবে না। সিল করা ব্যালট বাক্স পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে, যা গোনাই হয়নি। অথচ ফল বেরিয়ে গেছে। কে জিতেছে তাও এখনও পর্যন্ত ঠিক করে উঠতে পারেনি রাজ্য নির্বাচন কমিশন। লজ্জা ঢাকার ন্যূনতম আশ্রয় নেওয়া হয়নি, কেননা লজ্জা বোধ বিদায় নিয়েছে শাসকদলের। লক্ষ্য করার বিষয়, এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেখা গেছে শাসকদল ও প্রশাসনের যৌথ আক্রমণ। পুলিশই শুধু দুষ্কৃতীদের সঙ্গী হয়েছে, তা নয়। একাংশের প্রশাসনিক আধিকারিকরা ক্রমাগত বেনিয়ম এবং অন্যায় কাজ করে গেছেন। 'ওপরতলার' নির্দেশ মানতে গিয়ে সংবিধানের নিয়ম অস্বীকার করা হয়েছে। গণনাকেন্দ্রে লুটের পদ্ধতি দেখে এখন যে কেউ বুঝছেন তা এক বড়ো পরিকল্পনার অংশ। একই কায়দায়, একই সময়ে তা করা হয়েছে। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে তৃণমূল বাহিনী যখন এই কাজ করছে তখন নির্দিষ্ট আধিকারিকরা তাদের সাহায্য করেছেন। যে সামান্য কয়েকটি তদন্ত এখন পর্যন্ত হয়েছে তাতে ডাক পেয়েছেন বিডিওরা। আদালতে দাঁড়িয়ে সঙ্গত প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারছেন না। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন লুট হয়েছিল। গণনাও বিকৃত করা হয়েছে। এমন দৃশ্য অতীতে কোনও নির্বাচনে কেউ দেখেননি। বিডিওরাই কেবলমাত্র ছিলেন না, পুলিশ ও প্রসাশনের শীর্ষ পর্যায়ের আধিকারিকরা তৃণমূলকে জেতাতে কোমর বেঁধে নেমেছিলেন। এমন ভাবা কষ্টকল্পনা হবে না যে রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তরের আধিকারিকদের কেউ কেউ ভোট লুটের এই পরিকল্পনায় কার্যত নেতৃত্ব দিয়েছেন।

গ্রামের মানুষের বিরুদ্ধে এমন মরিয়া যুদ্ধে তৃণমূল নামলো কেন? তৃণমূলের রাজনীতির মৌলিক প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। বিজেপি-বিরোধিতার রাজনীতি ছাড়া তৃণমূলের অন্য কোনও উপাদান নেই। এখন দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার পরে সম্পদ আত্মসাৎ করার সহজ পদ্ধতিতে তারা চলছে। এর ফলেই দুর্নীতি সর্বজনীন চেহারা নিয়েছে। পঞ্চায়েতে যে টাকা আসছে বা গ্রামের প্রকল্পের জন্য যে টাকা আসছে তা খেয়ে নিচ্ছে তৃণমূলের নেতারা। ছিটেফোঁটা যা পড়ে থাকছে, তা বিলি করা হচ্ছে। যত সময় গেছে দুর্নীতির পরিমাণ এত বেড়ে গেছে যে বিলি করার মতোও আর টাকা থাকছে না। শাসক দলের পেটে ঢুকে গেছে গ্রামের লোকের প্রাপ্য অর্থ, বরাদ্দ, সম্পদ সবই। এর ফলে গ্রামে একদল নব্য ধনী তৈরি হয়েছে। এদের যারা চালাচ্ছে তারা আরও বড়ো ধনী। পঞ্চায়েতের টাকা খেয়ে বগটুইয়ের আনারুলের যদি প্রাসাদপম বাড়ি হয়, তাহলে এদের চালানো অনুব্রতের কোটি কোটি টাকা। আবার অনুব্রতদের যারা চালাচ্ছেন তাদের লন্ডন, থাইল্যান্ডের ব্যাংকে টাকা। এই সম্পদ আত্মসাতের জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োজন। যেখানে কোনও প্রশ্ন, দায়বদ্ধতার অবকাশ থাকবে না। সেই লক্ষ্যেই তৃণমূলের নেতারা এবং দল হিসেবে তৃণমূল ক্ষমতার জন্য মরিয়া। গণতন্ত্রে এই ঝুঁকি থেকেই যায় যে কোনও দল কোথাও হেরে গেলে। তৃণমূলের গতিসূত্রই এমন যে হেরে গেলে চলবে না। রাজ্যের ক্ষমতা থেকে তৃণমূল একবার সরে গেলেই দল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। সুতরাং গণতন্ত্রকে হত্যা না করে তৃণমূলের কোনও উপায় নেই। আসলে আমরা যাদের দেখছি তারা 'ডেমোক্র্যাসি ইটার্স অব বেঙ্গল'।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার অভিযান কিন্তু এবারের নির্বাচনের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। দেখা গেছে, গ্রামের মানুষ এই আক্রমণ প্রতিহত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। মনোনয়ন জমা করা থেকে গণনা পর্যন্ত অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে তাদের যেতে হয়েছে। কিন্তু সহজে শাসক দলকে রাস্তা ছেড়ে দেননি তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য গ্রাম হয়ে উঠেছে প্রতিরোধের ময়দান। এই লড়াইতে তপশিলি জাতি, জনজাতি, তরুণ-যুব সম্প্রদায়, এমনকী মহিলাদেরও স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভ প্রতিফলিত হয়েছে। যে ক্ষোভ নির্বাচনের পরে কমার বদলে বেড়ে গেছে। তৃণমূল যে গণতন্ত্র লুট করেছে, তা মানুষকে আরও ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। রাজ্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে।

পাত্র চাই

পাত্রী সংস্কারী, মেধাবী, অভিজাত বংশোদ্ভূতা, বি-টেক, কর্মরতা, ২৪ বর্ষীয়া।
উপযুক্ত পাত্র চাই।
মো : ৯৮৮২৭০১৪৮৯

সেবা সাধনা : এক

একজন সত্যিকারের কর্মী অজিতজী

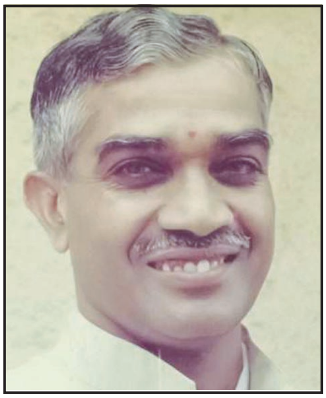

সমাজে সেবা কাজে যারা সারা জীবন বিলিয়ে দিতে পারেন তাঁদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সংগঠনের সম্মতিতে, ১৯৮০ সালে 'হিন্দু সেবা প্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠা করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক অজিতজী। তিনি সেইসব যুবক-যুবতী যারা সেবাকর্মী হতে চায় এরকম ২৩ জনের প্রথম ব্যাচের ৪০ দিনের প্রশিক্ষণ শুরু করেন। সেই সমস্ত স্বেচ্ছাসেবরা নেলে, অরুণ, চেতনা, প্রসন্ন কাউন্সেলিং সেন্টার, সেবামিত্র, সুপ্রজার মতো আজ অনেক প্রকল্প পরিচালনা করেছেন তারা এখান থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। অজিতজীর চারাগাছ এখন বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার ৪২ বছরে এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ৪০০০ জনেরও বেশি সেবাব্রতী সেবার জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, যার মধ্যে ৩৫০০ জন মহিলা। এর মধ্যে বেশিরভাগ তাদের যৌবনের ৩-১০ বছর এবং এমনকী কেউ কেউ তাঁদের পুরো জীবন সেবার জন্য উৎসর্গ করেছেন।

অজিতজী বেঙ্গালুরুতে বিই করার সময় কামবানপেটের কল্যাণ শাখায় স্বয়ংসেবক হন। যদিও তাঁর সঙ্ঘ শিক্ষা দেরিতে শুরু হয়েছিল, কিন্তু কলেজ জীবনে প্রথম বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গের পরেই তাঁর জীবনের দিক পরিবর্তন হয় কলেজ জীবনে স্টুডেন্ট কাউন্সিলের কাজ করতে গিয়ে অভাবী ভাই-বোনদের জীবনের উন্নতির জন্য ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিলেন।

১৯৫৭ সালের সঙ্ঘের প্রচারক হওয়ার পর তিনি ১৯৬০-৭৫ সাল পর্যন্ত সঙ্ঘের শাখার বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার সময় জরুরি অবস্থায় মিসাতে বন্দি হিসেবে ২ বছর জেলে ছিলেন। জেলখানায় তিনি বন্দিদের যোগব্যায়াম প্রশিক্ষণ দেন। সঙ্ঘের ক্লাসের পাঠ্যক্রমে যোগব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কৃতিত্ব অজিতজীকে দেওয়া যায়। এর জন্য তিনি বিশিষ্ট যোগাচার্য পট্টভীর কাছে যোগাসন শিখেছিলেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বর্তমান সরকার্যবাহ, দত্তাত্রেয় হোসবালে তখন অজিতজীর সহযোগী ছিলেন। তিনি হিন্দু সেবা প্রতিষ্ঠানে সেবা কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য পাঠ্যক্রম তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে অজিতজী ক্রমাগত চিন্তিত ছিলেন যে লক্ষ লক্ষ লোকের সেবা প্রয়োজন কিন্তু যারা সেবা করেন তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয় আর যেসব মহিলার স্বভাবে সেবা আছে, তাঁরাও সেবাকাজ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। হয়তো তাঁর এই বেদনাই সেবা কাজের প্রেরণা দিয়েছে। অর্থাৎ সেবার জন্য ভালো মানুষ তৈরি করে বঞ্চিত সমাজের উত্থানে নিয়োজিত করা। এর জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠান ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য, মহাপুরুষদের জীবনী, সেবার প্রয়োজনীয়তা, যোগব্যায়াম ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সেবাভাবী যুবক-যুবতীদের ৪০ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়। এরপর চাকরিজীবীরা তাদের আগ্রহ অনুযায়ী ৩ বছর সময় দেন। এ সময় প্রতিষ্ঠানটি তাদের থাকা-খাওয়ার পাশাপাশি সম্মানিক হিসেবে স্বল্প পরিমাণ অর্থ দেয়ার ব্যবস্থা করে। যৌবনে তাদের জীবনের তিন বছর সেবামূলক কাজে দেওয়ার পর অধিকাংশ সেবাকর্মীই তাদের সারা জীবন শুধু সেবা কাজের জন্যই উৎসর্গ করেন।

১৯৮৯ সালে এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে, বনিতা হেগড়েজী বহু বছর ধরে সংস্থায় মহিলা বিভাগের পরিচালক ছিলেন এবং পরে তাঁর বাকি জীবন সেবা কাজে নিয়োজিত করেছিলেন এবং তিনি কার্যক্ষেত্রে প্রতিটি সেবাকর্মীদের বলেছেন যে, অজিতজী সংস্থা প্রতিষ্ঠার পরে মাত্র নয় বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু এই ন'টি বছরে তিনি তার সমস্ত শক্তি এই উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছিলেন। ভাবনাটিকে সফল করার জন্য সময় দান করেছিলেন। প্রশিক্ষণের সময় তিনি সেখানে পুরো সময় থাকতেন এবং সকল অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। সেবা বস্তিতে কারা কাজ করতে পারবে, কার সামর্থ্যকে কাজে লাগানো যায় যোগ্য কেন্দ্রে, তা তিনি ভালো করেই বুঝতেন। তিনি শুধুমাত্র চাকরিজীবীদের সঠিক পরিকল্পনাতেই নয়, তাঁরা যাতে সেখানে সঠিকভাবে কাজ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তিনি মাঠে গিয়ে প্রতিটি সেবাকর্মীর সঙ্গে দিন কাটানোর চেষ্টা করতেন। তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ ও বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তায় মুগ্ধ হয়ে বহু যুবক-যুবতী আজীবন সেবার অঙ্গীকার গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হন। কিন্তু সময়ের নিষ্ঠুর আক্রমণ তাঁকে আমাদের সবার কাছ থেকে অসময়ে ছিনিয়ে নেয়। মাত্র ৫৬ বছর বয়সে ১৯৯০ সালের ৩ ডিসেম্বর বেঙ্গালুরু সঙ্ঘকার্যালয় কেশব কৃপা থেকে তুমকুর যাওয়ার সময় ভোর ৪ টায় গাড়ি দুর্ঘটনায় তিনি পরলোকগমন করেন। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নানাজী দেশমুখ বলেছিলেন, একথা বিশ্বাস করা কঠিন যে ১৬ বছর বয়সে একজন তরুণী নিজেই সেবাকাজের জন্য একটি ফর্ম পূরণ করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। অজিতজী এই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখিয়েছেন। □

পঞ্চতন্ত্রের গল্প

ভাবিয়া করিয়ো কাজ

এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করত। তারা খুব গরিব। দেবশর্মা নামে সেই ব্রাহ্মণ লোকের বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে দিন কাটাত। লোকের বাড়ি থেকে যা জুটত তাই দিয়ে কোনোমতে দিন কাটাত। ভিক্ষা করতে না গেলে সেইদিন তাদের আহারই জুটত না।

এমনই পারিবারে একদিন ব্রাহ্মণীর কোল আলো করে এক ফুটফুটে শিশুর জন্ম হলো। যেদিন শিশুটির জন্ম হলো সেইদিনই কোথা থেকে একটি বেজি এসে বাড়িতে ঢুকল। পরদিন দেখা গেল মা বেজিটি মরে পড়ে আছে আর তার দুধ পান করছে একটা শিশু বেজি।

ব্রাহ্মণী তাই দেখে ছানাটিকে যত্ন করে কোলে তুলে নিল। নিজের শিশুর মতোই তাকে খাইয়ে, যত্ন করে বড়ো করতে লাগল। সন্তান স্নেহে বেজিটিকে বড়ো করলেও জন্তু বলে পুরোপুরি বিশ্বাস করত না। তাই নিজের শিশুকে

চোখে চোখে রাখত।

তিন মাসে বেজিটি বেশ বড়ো ও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। একদিন ব্রাহ্মণী ঘড়া নিয়ে জল আনতে চলল পুকুরে। যাবার সময় কর্তাকে গেল বাচ্চাটা বিছানায় আছে, লক্ষ্য রেখো। আমি জল আনতে যাচ্ছি। বেজিটাকেও বলল, ভাইকে দেখিস।

ওদিকে কিছুক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণের মনে হলো ভিক্ষার দেরি হয়ে যাচ্ছে। পরে তো ভিক্ষা পাওয়া যাবে না। আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। ব্রাহ্মণ ঝুলি নিয়ে বেবিয়ে পড়ল।

শিশুটি বিছানায় আপন মনে খেলা করছে। এমন সময় উঠোনের একটি গর্ত থেকে একটা কেউটে সাপ বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠে ফণা তুলে হিস হিস শব্দ করতে লাগল। বেজি বসে ছিল দাওয়ার এক কোণে। দূর থেকে তার শত্রুকে চিনতে ভুল হয়নি। সেও শব্দ করে লাফিয়ে পড়ল কেউটের উপর। তারপর দুজনের কী ভীষণ যুদ্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেজি সাপটিকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল। সাপের রক্তে বেজির মুখ ও সারা শরীর মাখামাখি হয়ে গেল।

শত্রুকে শেষ করতে পেরে মনের আনন্দে বেজি ছুটে রাস্তায় এল। ব্রাহ্মণী তখন কলসীতে জল নিয়ে বাড়ির দরজায় এসে পড়েছে। বেজি দৌড়ে তার পালিতা মায়ের পায়ে মাথা ঘষে লুটোপুটি খেয়ে আনন্দ প্রকাশ করছিল। ব্রাহ্মণী রক্তমাখা বেজিকে দেখে চমকে উঠল। ভাবল, বেজিটা তার শিশুকে মেরে ফেলেছে। রাগে দিশেহারা হয়ে সে চিৎকার করে উঠল। তারপর কলসীটাকে আছড়ে ফেলল বেজির মাথায়। বেচারি বেজি সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। ব্রাহ্মণী পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে এসে দেখে তার শিশু আপন মনে খেলা করছে আর তার পাশেই টুকরো টুকেরো হয়ে পড়ে আছে একটা বিশাল কালকেউটে।

ব্রাহ্মণী নিজের ভুলের জন্য বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল। ছুটে এলে দেখল কাদাজলের মধ্যে বেজিটা মরে পড়ে আছে। ব্রাহ্মণী মরা বেজিটাকে বুকে চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে এল। একটু পরেই ব্রাহ্মণ ভিক্ষা সেরে ফিরে এল। সব দেখেশুনে ব্রাহ্মণীকে বলল, ভাবিয়া করিয়ো কাজ, করিয়া ভাবিয়ো না।

সংগৃহীত

বীর বনবাসী

রামজী গোণ্ড

জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামী রামজী গোণ্ড অধুনা তেলেঙ্গানা রাজ্যের আদিলাবাদের শোনকাস গ্রামে জন্ম। তিনি গোণ্ড, মাহার, রোহিল্লা জনজাতি যুবকদের নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। ব্রিটিশ অফিসার কর্নেল রবার্ট তাঁদের এলাকা আক্রমণ করলে এক হাজার যোদ্ধা নিয়ে রামজী তাদের প্রতিরোধ করেন। যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি নিহত হয়। এরপর বেলারি সেনা, নিজামের সেনা ও ব্রিটিশ সেনা একযোগে আক্রমণ করলে রামজী ধরা পড়েন। ১৮৬০ সালের ৯ এপ্রিল রামজী গোণ্ড এবং তাঁর সঙ্গীদের নির্মল গ্রামে এক প্রাচীন বটগাছে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

জানো কি?

- ভারতে সংবিধান স্বীকৃত ২২টি ভাষা।
- আয়তনের দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ১৪তম রাজ্য (৮৮,৭৫২ বর্গকিমি)।
- ফিজিকে ক্ষুদ্র ভারত বলা হয়। সেখানে ৩৮ শতাংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত।
- চীনের প্রাচীরের পর দীর্ঘতম প্রাচীর রাজস্থানের কুম্ভলগড় দুর্গের প্রাচীর।
- ভারতের ব্যস্ততম রেলস্টেশন শিয়ালদহ।
- বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক কর্মচারী সংবলিত প্রতিষ্ঠান হলো ভারতীয় রেল।

ভালো কথা

বৃক্ষরোপণ

এবার অরণ্যষষ্ঠীর দিন আমাদের গ্রামে গাছ লাগানোর ধুম পড়ে গিয়েছিল। বাবা ও পাড়ার কাকু-জ্যেঠুরা দুদিন আগে ব্লক নার্সারি থেকে বিভিন্ন রকমের গাছ এনেছিল। ষষ্ঠীর দিন পুজো হয়ে যাবার পর প্রত্যেকেই নিজের নিজের জায়গায় গাছ লাগিয়েছে। যাদের বাড়িতে জামাই এসেছিল, তারা জামাইয়ের হাত দিয়ে গাছ লাগিয়েছে। আমরা দশটা নিমগাছ লাগিয়েছি। বাবা বলেছে যারা যে গাছ লাগিয়েছে, তাদেরই সেই গাছের পরিচর্যা করতে হবে। বাবা প্রস্তাব দিয়েছে আগামী বছর গ্রামে দুশো নিমগাছ লাগাতে হবে।

সুভদ্রা পাল, দশম শ্রেণী, শিলচর, অসম

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ড়া ক ল পো

(২) বাঁ হা রা ন

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ত দু হ রা সু র প

(২) জি কী সা ক মা ণ র

২৪ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) ঔষধালয় (২) নয়নতারা

২৪ জুলাই সংখ্যার উত্তর

(১) আক্কেলগুড়ুম (২) আগাপাশতলা

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী রায়, রায়নগর,ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।। (২) শিবাংশী পাণিগ্রাহী, ইংলিশ বাজার, মালদা। (৩) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কলকাতা-৪৯। (৪) পঙ্কজ দাস, নামোপাড়া, মানবাজার, পুরুলিয়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

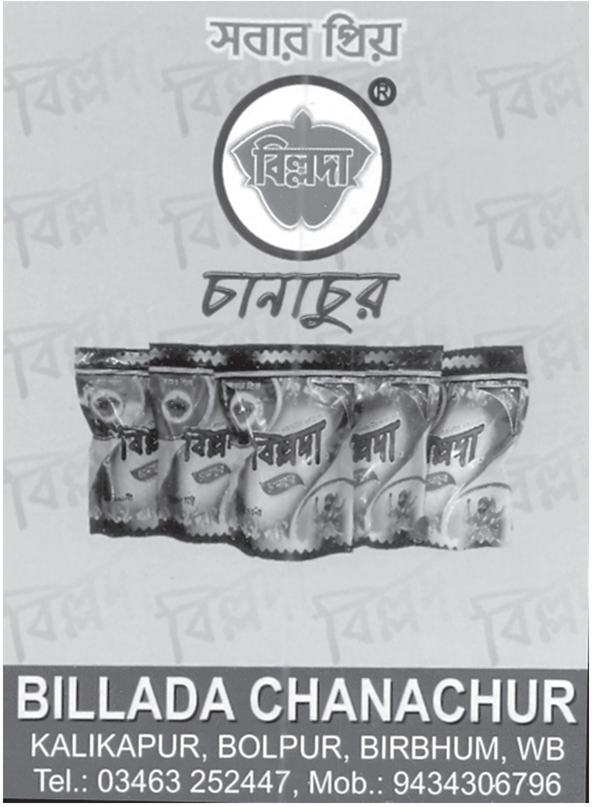

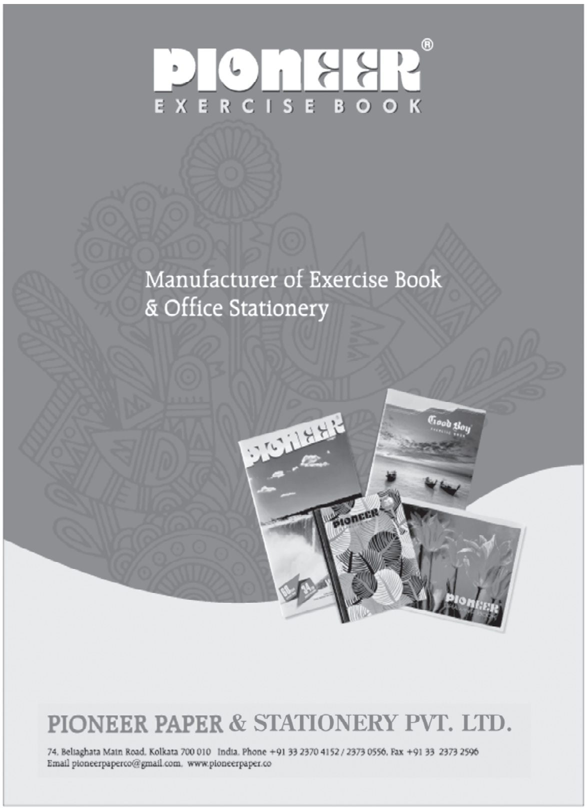

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

অগ্নিশিশু ক্ষুদিরামের ছেলেবেলা

দীপক খাঁ

একজন ব্যক্তি কোনো কারণে বিখ্যাত হয়ে উঠলে খুবই স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মধ্যে কৌতূহল জেগে ওঠে— ওই ব্যক্তির বাল্যকাল, কৈশোরকাল তারুণ্যের সময়গুলি কেমন ছিল? এটা যে ব্যক্তি যেমন ভাবে পরিবেশগত ভাবে শিক্ষা পেয়েছে তদনুযায়ী সেই ব্যক্তির ব্যাপারে একটা ধারণা করতে পারে— সেটা ভালো বা মন্দ যাইহোক না কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লেখার আগে বন্দে মাতরম্ গানটি লিখেছিলেন। কিন্তু আনন্দমঠ উপন্যাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে 'বন্দেমাতরম্' শীর্ষক জাতীয় সংগীতটি। বন্দেমাতরম্— মানে জন্মভূমি ভারতবর্ষকে মাতৃরূপে বন্দনা করি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, সুজলা-সুফলা শষ্যশ্যামলা মাতৃভূমি বিদেশি রাজশক্তির শাসনে ও অত্যাচারে জর্জরিতা, নিষ্পেষিতা, নির্যাতিতা। এতোবড়ো একটা বিশাল বিপুল জনগোষ্ঠীর সঞ্জীবনী মন্ত্র হয়ে উঠল--- বন্দেমাতরম্! এই মন্ত্রই ছিল দেশের হাজার হাজার মুক্তিপাগল মানুষের জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার প্রেরণা! তাই কোনো আবেদন- নিবেদন নয়, ভিক্ষা নয়, বিদ্রোহ-বিপ্লবের রক্তরাঙা পথই বেছে নিতে বাধ্য হলেন, দেশের তরুণ বিপ্লবীসমাজ। সবার কণ্ঠে উঠেছিল গানের সুর 'মাগো যায় যাবে জীবন চলে। শুধু তোমার কাজে জগৎ মাঝে। বন্দেমাতরম্ বলে।'

বিপ্লবী বীর ক্ষুদিরাম সেদিনের সেই তরুণ দলের অগ্রপথিক, মুক্তিপথের এক অবিস্মরণীয় অগ্রদূত, অগ্নিযুগের এক অগ্নিবালক যাঁর জীবন স্বল্পায়ু, কিন্তু কীর্তি কালজয়ী।

ফঃ ৬

মেদিনীপুর শহরের হবিবপুর এলাকায় ছিল এক প্রসিদ্ধ কালীমন্দির। এই সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরের দেবীমূর্তি খুবই জাগ্রতা। একদিন এই মন্দিরে এসে হত্যে দিয়ে পড়লেন লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী আর সঙ্গে তাঁর তিন মেয়ে--- অপরূপা, সরোজিনী ও ননীবালা। লক্ষ্মীপ্রিয়ার দুটি ছেলে হয়েছিল কিন্তু তাঁরা অল্পদিনেই বিদায় নিয়েছিল ধরাধাম থেকে। তাই একটি পুত্রসন্তান কামনা করে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী হত্যে দিয়ে পড়লেন সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে। মন্দিরে হত্যে দেবার পরে তৃতীয় রাত্রে স্বপ্নাদেশ পেলেন— তাঁর একটি পুত্রসন্তান লাভ হবে কিন্তু স্বল্পায়ু হবে। আশা ও আশঙ্কায় তাঁর হৃদয় দুলতে থাকে। সেদিন কেউ জানত না, সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সেই স্বপ্নাদেশ এদেশে একদিন নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে। স্বপ্নাদেশ পাওয়ার ঠিক এক বছর পর ১৮৮৯ সালে ৩ ডিসেম্বর, বড়দিদি অপরূপা দেবীর স্মৃতিচারণে—

‘সেদিন কী আনন্দ আমাদের! এর আগে পরপর দুটি ভাই মারা গেছে, আজ আমরা বাঙ্গালি ঘরের অভিসম্পাত তিন-তিনটি বোন অজয়, অমর হয়ে বেঁচে রইলাম, এ লজ্জা রাখবার যেন ঠাঁই পাচ্ছিলাম না। নবজাতক ভাইটিকে কিনে নিলাম তিন মুঠো খুদ দিয়ে।’ আমাদের গ্রামীণ জীবনে এক প্রচলিত বিশ্বাস— যে নারীর সন্তান বাঁচে না, তাঁর কাছ থেকে অন্য লোকে সন্তান কিনে নিলে সে সন্তানের নাকি গোত্রান্তর ঘটে, তার মৃত্যুভয় দূরীভূত হয়। যার জীবনের দাম মাত্র তিন মুঠো খুদ, তার নাম ক্ষুদিরাম ছাড়া আর কীই-বা রাখা যায়?

এর মাত্র ছ’বছর বয়সে তিনি মাকে হারালেন। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর মৃত্যু ১৩০২ সালের ২ কার্তিক কালীপূজার রাত্রিতে। পিতা ত্রৈলোক্যনাথ পড়লেন সংকটে। সংসার ও সন্তানের স্বার্থে তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন সুশীলা দেবীকে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার দেহাবসানের মাত্র চার মাস পরে নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় ত্রৈলোক্যনাথের। সাংসারিক নিয়ম-নিগড়ে এই বন্ধনহীন শিশুকে বন্দি করে রাখা প্রায় অসম্ভব। নিঃসম্বল ও অসহায় ক্ষুদিরাম তখন নিতান্ত এক নিরাশ্রিত বালক। শেষ অবধি ওদের আশ্রয় জুটল তাঁদের আত্মীয় অবিনাশচন্দ্র বসু ও কৃত্তিবাস বসুর বাড়িতে। কৃত্তিবাসের স্ত্রী ছিলেন ক্ষুদিরামের ধর্মমাতা। কিন্তু এই অবস্থাও বেশিদিন চলল না। ওখান থেকে ভাই-বোনকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এলেন অপরূপা এবং তাঁর স্বামী অমৃতলাল রায়। অমৃতলাল-অপরূপা ননীবালার বিয়ের জন্য সচেষ্ট হলেন। কিন্তু ননীবালার বিয়েতে পাত্রপক্ষের দাবি দাওয়া মেটাতে ক্ষুদিরামের বসতবাড়িটি বিক্রি করে দিতে হয়। অবশ্য ওই টাকা শুধু ননীবালার বিয়েতে খরচ হয়নি। ওই টাকা দিয়ে ত্রৈলোক্যনাথের বকেয়া ঋণও পরিশোধ করতে হয়েছিল। অপরূপার কাছে ক্ষুদিরাম মাতৃস্নেহের স্বাদ পেয়েছিলেন। অমৃতলালের কাছে পেলেন আশ্রয় ও নিরাপত্তা।

১৯০১ সালে অমৃতলাল চাকরির প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে সপরিবারে তমলুক শহরে চলে এলেন। ওই এলাকায় তখন হ্যামিলটন স্কুল বেশ নামজাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সেখানে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন তেরো বছরের কিশোর ক্ষুদিরাম। অমৃতলাল তাঁর নিজের ছেলে ললিতমোহনকেও ওই একই স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ললিতমোহন ছিলেন ক্ষুদিরামের চেয়ে দু’ বছরের ছোটো কিন্তু সেই ছিল ক্ষুদিরামের খেলার সঙ্গী, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং অন্তরঙ্গ সহপাঠী। পরবর্তীকালে খ্যাতিমান ক্ষুদিরামের তৎকালীন জীবনের অনেক অজানা তথ্য জানা গেছে এই ললিতমোহনের জবানবন্দিতে। দুষ্টুমি ও দস্যিপনায় সবাইকে অবাক করে দিতেন। কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁর তেমন আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। তার কাজকর্ম ছিল উদ্ভট এবং বিচিত্র। ঢিল মেরে পাখির বাসা ভাঙতে হবে, বাড়ির ছাদ বা গাছের উঁচু ডাল থেকে লাফিয়ে পড়ে শক্তিপরীক্ষা করতে হবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কেটে নদী বা পুকুর তোলপাড় করতে হবে; কখনও-বা রণপাতে চড়ে বরযাত্রীদের সঙ্গে যেতে হবে। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তেন তাঁর বিচিত্র খেয়াল মেটাতে।

একবার অপরূপা দেবী ভাইয়ের কাজে বিরক্ত হলেন। ভাবলেন, ভাইকে শাসন করা দরকার। ক্ষুদিরাম বিছানায় বসতেই অপরূপা দেবী যখন ওকে মারতে এলেন তখন মুহূর্তের মধ্যে ললিতমোহন মামাকে বুঝে ওঠার অবকাশ না দিয়ে একটা লেপ দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। ভাইকে মারতে গেলে তখন ছেলেকে না মেরে উপায় থাকে না। কিন্তু ছেলের তো বিন্দুমাত্র দোষ নেই।

একবার তমলুক শহরে কলেরা দেখা দিল মহামারীরূপে। জীবনের পরোয়া না করে ক্ষুদিরাম রোগীদের সেবা-শুশ্রূষায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শ্মশানে নির্ভয়ে গিয়ে কলেরা রোগীর মড়া পোড়াতে চললেন দিনের মধ্যে চার-পাঁচবার। সমবয়সি ছেলেরা ওর কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেল।

—তুমি একা কখনও শ্মশানে যেতে পারো?

—হ্যাঁ পারি, দিনে নয় রাত্রিতে কিন্তু?

শ্মশানের পাশে যে তেঁতুলগাছ আছে, সেখান থেকে একটা ডাল ভেঙে এনে তোমাদের দেখাবো। যে কথা, সেই কাজ। বন্ধুরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল।

একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল তাঁদেরই স্কুলের একজন ছাত্র নিয়ে। তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়েছে। বিদেশি পণ্যবর্জন এই আন্দোলনের একটি অঙ্গ। শহর ও মফস্‌সলে বিলিতি জিনিস ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ স্বদেশি জিনিস ব্যবহারের জন্য ডাক দিয়েছেন জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গ। যেমন করেছিলেন ক্ষুদিরামের এক সহপাঠী— ফণিভূষণ ঘোষ। তিনি একদিন দেশি মিলের মোটা কোরা কাপড়ের জামা পরে স্কুলে এসেছিলেন। ওর বিচিত্র ধরনের জামা দেখে সহপাঠী ছেলেরা পিছনে লাগল। তিনি এগিয়ে এসে সবাইকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, ও নিজের দেশের জামা পরে স্কুলে এসেছে বলে তোমরা হাসাহাসি করছ। তোমাদের লজ্জা করে না? ও যথেষ্ট ভাগ্যবান যে দেশের তৈরি জামা পরেছে। আমার দুঃখ হচ্ছে আমার ওরকম একটাও জামা নেই। সেদিন তারা ক্ষুদিরামের কাছে প্রতিজ্ঞা করল, এখন থেকে তারাও মোটা স্বদেশি কাপড় পরবার চেষ্টা করবে।

একবার মাস্টারমশাই ক্লাসের ছেলেদের একটা উদ্ভট পরীক্ষা দিতে বললেন। সবাইকে

দেখাতে হবে কার হাতে কত জোর। টেবিলের ওপর সজোরে ঘুষি মেরে দেখাতে হবে কে কত বেশিবার ঘুষি মারতে পারে। কিশোরদের নরম হাত এইভাবে কটা ঘুষি মারা সম্ভব? সবাই পাঁচ-ছ'টা ঘুষি মেরে সরে পড়ছিল। এবার সকলের সামনে বীরদর্পে এগিয়ে এলেন ক্ষুদিরাম। তিনি টেবিলের সামনে এসেই সপাটে একটার পর একটা ঘুষি চালাতে শুরু করলেন। মুখে যন্ত্রণার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। হাতেও নেই কোনো যন্ত্রণার ভাব। একটার পর একটা ঘুষি মেরে চলেছে টেবিলে। থামবার কোনো লক্ষণ নেই। দেখা গেল ক্ষুদিরামের হাতের মুঠোর ফাঁক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। মাস্টারমশাই এসে চেপে ধরলেন তাঁর রক্তাক্ত হাতখানা— 'থামো থামো ঢের হয়েছে। তোমাকে আর ঘুষি মারতে হবে না। মনে হয় তোমার হাতখানা ভেঙে গুড়িয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তুমি ঘুষি চালিয়ে যাবে', আমি স্বচক্ষে এই দৃশ্য না দেখলে কোনো মানুষ যে এই কাজ করতে পারে তা বিশ্বাস করতাম না। ওর হাতের পরিচর্যা করতে ক্ষুদিরামকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন লজ্জিত মাস্টারমশাই।

বাঁশের বাঁশি নিয়ে আপন মনে তিনি যখন বাজাতেন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি, তখন কে বলবে এই দামাল ছেলেটিই সকলের চোখে এক দুঃসাহসী বীর বালক? ক্ষুদিরামের আরও একটি শখ ছিল, ডিটেকটিভ কাহিনি পড়া। পাঁচকড়ি দে ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক। মনে হয় তাঁর ভাবী জীবনের গঠনে গোয়েন্দাদের দারুণ বুদ্ধি, সাহস আর মনোবল থেকে তিনি শিক্ষা নিতেন। তখন ক্ষুদিরাম কেমন ছিলেন তা জানা যায় অপরূপার জবানবন্দিতে : 'খুব দুরন্ত, লেখাপড়াতে মন নেই, শুধু খেলা আর খেলা। আবার যেদিন পড়ায় মন বসত, সেদিন যেন তপস্যায় রত। মাস্টার আশু রায়ের মতো। কিছু শাস্তি ছিল, আর সবই হার মেনে ছিল ক্ষুদিরামের একগুঁয়েমির কাছে।'

ক্ষুদিরামের অস্ত্রগুরু বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর ওই নাবালক শিশুটির পরিচয় দিতে গিয়ে লিখছেন— 'যা করতে হবে বলে একবার সে স্থির করত, তা সাধনকালে যত কঠিন বলে অনুভূত হোক না কেন, তা সম্পন্ন করতে মৃত্যু আসন্ন হলেও সে কাজ যে অসম্পূর্ণ রেখে ছেড়ে দিত না। হাডুডু খেলার সময় ছোটোখাটো রোগা ক্ষুদিরাম সাংঘাতিক রূপে ক্ষতবিক্ষত হওয়া অবশ্যম্ভাবী জেনেও তখন মরিয়া হয়ে প্রতিপক্ষকে জড়িয়ে ধরত যে, অপেক্ষাকৃত অনেক বলবান ছেলেও তার হাত থেকে ছাড় পেত না। এত অল্প বয়সে ছাদ থেকে লাফিয়ে নীচে পড়া, সমস্ত রাত তেঁতুলগাছে বসে ভূত দেখা, নদীর ভীষণ

স্রোতের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়া ইত্যাদি অনেক কাজ থেকে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যেত।'

১৯০৪ সালে ক্ষুদিরাম মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়। অল্প দিনের মধ্যেই স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ক্ষুদিরাম শিক্ষক ও ছাত্রদের নজর কেড়ে নেয় দোহারা চেহারার এই প্রাণচঞ্চল ছেলেটি সকল শিক্ষকের প্রিয়পাত্র হলেও তিনি সবচেয়ে স্নেহের পাত্র হয়ে উঠলেন স্কুলের ব্যায়াম শিক্ষকের। তাঁর জুড়ি ছিল না প্যারালাল বারের খেলায়। ওই সময় একবার ওখানে এসেছিলেন বাঙ্গলার লেফটেন্যান্ট গর্ভনর বা ছোটোলাট। ছোটোলাট ক্ষুদিরামের প্যারালাল বারের খেলা ও কলাকৌশল দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে ব্যায়াম শিক্ষকের মাইনে স্বেচ্ছায় বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

অনন্তলাল সাহু ছিলেন তাদের শ্রেণীশিক্ষক। স্বভাবে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। কোনো ছাত্র পড়া বলতে না পারলে, তাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে বেত মারতেন তিনি। একদিন ক্লাসে ঢুকেই দেখলেন ক্ষুদিরাম বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। অনন্তবাবু এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে হেসে বললেন--- কী ব্যাপার? পড়া করে আসিসনি? ক্ষুদিরাম বলল, স্যার আজকেই আপনি পড়া না করার কারণ প্রথম জিজ্ঞেস করলেন। তা পড়া না করার আসল কারণটা কী শুনি! ক্ষুদিরাম বললে— স্যার আমাদের পাশের বাড়ির একটি ছেলের কলেরা হয়েছে। ওরা অত্যন্ত গরিব। ওর মা মুড়ি বিক্রি করে কোনোরকমে সংসার চালায়। কাল সারারাত জেগে আমি ছেলেটির সেবা করেছি। আজ ভোরের দিকে ছেলেটি একটু ভালো দেখে বাড়ি ফিরেছি। তাই আজ আর পড়া করে আসার সময় পাইনি। অনন্তবাবু ওর দিকে এগিয়ে এসে সস্নেহে ওকে বেঞ্চিতে বসিয়ে দিলেন। বললেন, তুই আমাকে আজ খুব শিক্ষা দিলি বাবা। পড়া করতে না পারার প্রকৃত কারণ তোদের নিশ্চয়ই থাকতে পারে।

এই দামাল ছেলেটি দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচন করতে যাওয়ার অপরাধে ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ফাঁসিতে প্রাণ বলিদান দিতে হয়।

(ক্ষুদিরাম বসুর বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

দেশে ২১টি নতুন গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর স্থাপনে মঞ্জুরি

পিআইবি॥ ১১টি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর ইতিমধ্যে কার্যকর রয়েছে। ভারত সরকার দেশে ২১টি নতুন গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর স্থাপনে মঞ্জুরি দিয়েছে। এগুলি হলো পশ্চিমবঙ্গে দুর্গাপুর, সিকিমের পাকইয়ং, অরুণাচলপ্রদেশের হোলোঙ্গি, গোয়ার মোপা, মহারাষ্ট্রের নভি মুম্বাই, শিরডি এবং সিন্ধুদুর্গ, কর্ণাটকে কালবুর্গি, বিজয়পুরা, হাসান এবং শিবমুগ্গা, মধ্যপ্রদেশে দাবরা (গোয়ালিয়র), উত্তরপ্রদেশে কুশীনগর এবং নয়ডা, গুজরাটে হিরাসর এবং ঢোলেরা, পুদুচেরীতে করাইকাল, অন্ধ্রপ্রদেশে দাগাদারথি, ভোগাপুরম ও ওরভাকল, কেরালার কুন্নুর। এর মধ্যে ১১টি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে। এগুলি হলো— দুর্গাপুর, শিরডি, কন্নুর, পাকইয়ং, কালবুরগি, ওরভাকাল, সিন্ধু দুর্গ, কুশীনগর, ইটানগর, মোপা ও শিবমুগ্গা।

তামিলনাড়ু সরকার অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রককে রাজ্যের কাঞ্চিপুরম জেলার পারান্দুর-এ একটি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর তৈরির জন্য প্রথম দফার মঞ্জুরি চেয়ে আবেদনপত্র জমা দিয়েছে। গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর নীতি অনুযায়ী ভারতের বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন পাঠাতে হয়। এরপর সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে আলোচনার পর গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের স্টিয়ারিং কমিটির কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়। তারা সেটি পর্যালোচনা করে স্থান সংক্রান্ত মঞ্জুরি দেন। গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দর নীতি ২০০৮ অনুযায়ী বিমানবন্দর প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দর স্থাপনকারী সংস্থার ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের হয়। রাজ্যসভায় অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী জেনারেল (ড.) ভি কে সিংহ (অবসরপ্রাপ্ত) এক লিখিত প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন।

ইউক্রেন বিষয়ে সৌদি আয়োজিত সম্মেলনে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, আগস্ট মাসে ইউক্রেনের বিষয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করতে চলেছে সৌদি আরব। এই সম্মেলনে ইউক্রেনের সঙ্গে পশ্চিমি শক্তি আমেরিকা-ইউরোপের দেশসমূহ ছাড়াও আমন্ত্রিত হতে চলেছে উদীয়মান শক্তি ভারত ও ব্রাজিল। এছাড়াও ইন্দোনেশিয়া, ইজিপ্ট, মেক্সিকো, চিলি, জাম্বিয়া, জেড্ডা-সহ প্রায় ৩০টি দেশের শীর্ষ আধিকারিকরা ৫-৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত হতে চলা এই সম্মেলনে অংশ নিতে চলেছেন।

সৌদি কর্তৃপক্ষ এই সম্মেলনের মাধ্যমে হতে চলা মধ্যস্থতার প্রক্রিয়া থেকে রাশিয়াকে

বাইরে রাখছে। রাশিয়া এই সম্মেলনে আমন্ত্রিত না হলেও ভারত আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ পেয়েছে। এই বিষয়টি আঞ্চলিক বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে জোটসমূহের অভ্যন্তরে সম্ভাব্য এক পরিবর্তনকে নির্দেশ করছে। ইউক্রেন-রাশিয়া সীমান্তে উত্তেজনার পারদ বৃদ্ধি যখন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ভারতকে এই মুখ্য মধ্যস্থতাকারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। ভারতের এই সদর্থক ভূমিকা এই জটিল ভূ-রাজনৈতিক পটভূমিতে এক অন্য মাত্রা যোগ করতে চলেছে। এই সম্মেলনের মাধ্যমে এই সংকটময় আন্তর্জাতিক স্থবিরতাকে অতিক্রম করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক নেতৃবর্গের সজাগ পর্যবেক্ষণে এই মধ্যস্থতার প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে।

ইউক্রেন-সহ অন্যান্য পশ্চিমি দেশসমূহের কূটনীতিবিদরা রাশিয়াকে বাদ দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সমর্থন সংগ্রহ এই সম্মেলনের মাধ্যমে সম্ভব হবে বলে মতপ্রকাশ করেছেন।

ইউক্রেনের ১/৬ অংশ ভূখণ্ড তাদের কবজায় বলে দাবি করে ক্রেমলিন জানিয়েছে, কিয়েভ 'নতুন বাস্তবতা সমূহকে' স্বীকার করে নিলেই শান্তি আলোচনা একমাত্র সম্ভব। এ বিষয়ে কিয়েভের প্রতিক্রিয়া হলো মস্কো তার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করলে তবেই শান্তি আলোচনা শুরু করা সম্ভব।

আমন্ত্রিত দেশগুলির মধ্যে ঠিক কতগুলি দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করতে চলেছে তা নিয়ে এখনই পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া না গেলেও গত জুন মাসে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের অংশগ্রহণকারী দেশগুলির যোগদান নিশ্চিত বলে সংবাদ সূত্রে প্রকাশ। ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, পোল্যান্ড ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের যোগদান নিশ্চিত করেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

সৌদি আরব ওপেক প্লাস গোষ্ঠীর মাধ্যমে রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। গত মে মাসে জেড্ডায় অনুষ্ঠিত আরব লিগ সম্মেলনে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লোদিমির জেলেনস্কি উপস্থিত হয়ে আরব দেশগুলির উদ্দেশে কিয়েভের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। এই সম্মেলন সৌদির ক্রাউন প্রিন্স মহম্মদ-বিন-সলমনের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পারে যখন তিনি ইয়েমেনের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শান্তি স্থাপন এবং ইরানের সঙ্গে আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে ইস্তানবুলে সৌদি কনস্যুলেটে ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক জামাল খাশোগি হত্যাকাণ্ডের দরুন রিয়াধ ও পশ্চিমি শক্তির সম্পর্ক এক টানাপোড়েনের সম্মুখীন হয়। আমেরিকার গোয়েন্দা এজেন্সি এই ঘটনায় প্রিন্স সলমনের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলে।

শোকবার্তা

শ্রী মদনদাস দেবী জী-র প্রয়াণের ফলে আমরা সকলে আমাদের জ্যেষ্ঠ সহযোগীকে হারিয়েছি। বিগত কিছু বছর যাবৎ তিনি শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে যুঝছিলেন। ২৪ জুলাই প্রাতঃকালে যার দুঃখজনক পরিসমাপ্তি ঘটলো। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের দায়িত্বে সঙ্ঘযোজনার মাধ্যমে প্রেরিত প্রথম প্রচারক মদনদাসজী। পরিষদের সংগঠন মন্ত্রীর দায়িত্ব তিনি দীর্ঘকাল পালন করেছেন। স্বর্গীয় যশবন্ত রাও কেলকারজীর সান্নিধ্যে এসে তিনি সাংগঠনিক কৌশলে দক্ষতা অর্জন করেন। তারপর '৯০-এর দশকে তিনি সঙ্ঘের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। সেই কঠিন সময়ে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্ঘের দায়িত্ব পালনে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

ওই সময়ে আমরা সবাই তাঁর সান্নিধ্যে বিভিন্ন দায়িত্বে কর্মরত ছিলাম। তাঁর তীক্ষ্ণ নিরীক্ষণ শক্তি, উন্নত চিন্তাধারা, সঠিক বিশ্লেষণ, কঠোর ভাবে প্রচারক ব্যবস্থার অনুশাসন পালনের সঙ্গে সকলের সঙ্গে মিশে যাওয়া কিন্তু সর্বদা সজাগ থাকার স্বভাবজাত ক্ষমতা আমাদের কাছে ছিল শিক্ষণীয়। শারীরিক ভাবে সুস্থ থেকে নেতৃত্ব দান করে তিনি আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবেন, এই ছিল আমাদের সবার ইচ্ছা। কিন্তু বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে কঠোর পরিশ্রমের দরুন তাঁর শরীর ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। নিয়তির কাছে মানুষের প্রত্যাশা হেরে গেল, যার পরিণতিস্বরূপ এই দুঃখজনক প্রসঙ্গের অবতারণা। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের বিষয়ে চিন্তা না করে স্বীয় কর্তব্য পথে অটল থেকে প্রতি মুহূর্তে অগ্রসর হওয়ার মূর্ত উদাহরণ মদনদাসজীর সম্পূর্ণ জীবন।

নিরলস জীবন সাধনার কারণে তিনি তাঁর সাধনোচিত ধামে গমন করবেন, সব শোক সন্তপ্ত সকলকে সমবেদনা জানিয়ে পরমেশ্বরের নিকট সহ্যশক্তি প্রার্থনা করে মদনদাসজীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের ব্যক্তিগত এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।

ডাঃ মোহন ভাগবত
সরসঙ্ঘচালক
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

শ্রী দত্তাত্রেয় হোসবালে
সরকার্যবাহ
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

মণিপুরের উপজাতিদের পেন কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে টেবল ফিস উৎপাদন

পিআইবি॥ উত্তরপূর্বের রাজ্য মণিপুরের নোনে জেলায় পশ্চিম পর্বতে মনচেনদিও নদী এলাকায় ৫৮ হেক্টর ক্ষেত্র জুড়ে তৈরি ছোটো জলাশয় খৌপুম রিজার্ভয়ার। ১৯৮৩ সালে নোনে এবং তামেংলং জেলায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য ও সেচের জন্য মূলত এই জলাশয়টি তৈরি করা হয়েছে। কারিগরি ত্রুটির জন্য এটি বেশ কিছুদিন ধরে নিষ্ক্রিয় ছিল। পরে এটিকে নতুন করে একটি জলাধারে পরিণত করা হয়।

খৌপুম উপত্যকার অধিবাসীরা মূলত কাবুই জনজাতি সম্প্রদায়ের। আইসিএআর-সিআইএফআরআই ২০২২ সালের মে মাসে এক সর্বেক্ষণের পর এই রিজার্ভারটিকে পেন কালচার প্রযুক্তির মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই এলাকার জনজাতি জনগণের জীবনযাত্রার ও পৌষ্টিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০১৭-র ডিসেম্বর মাসে ৭৩ জন সদস্য নিয়ে একটি বহুমুখী সুসংহত সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। এই জলাশয়ে মৎস্য চাষ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষণের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়। আশেপাশের মৎস্য চাষ ক্ষেত্রগুলি থেকে সিলভারকার্প, গ্রাসকার্প-এর মতো পরিচিত মাছ এখানে চাষ করা শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন হলো।

আইসিএআর-সিআইএফআরআই টেবল ফিস উৎপাদনের জন্য দুটি পেন এবং মাছের ডিম সরবরাহ করে। গ্রাসকার্প-এর জন্য যে পেনগুলি ব্যবহার করা হয় তা বিশেষভাবে উপকারি। এই প্রযুক্তি বিশেষভাবে সহায়কের ভূমিকা নিয়েছে এলাকার ছোটো-বড়ো মৎস্যজীবী ও সমাজের আর্থিক উন্নতিকল্পে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, গত জন্মাষ্টমী '২২ থেকে স্বস্তিকার ৭৫ বছর পালনের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই অবসরে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। সংরক্ষণযোগ্য এই গ্রন্থটি স্বস্তিকায় এযাবৎ প্রকাশিত বিশিষ্ট লেখকদের নির্বাচিত রচনার সংকলন। যেমন— রমেশচন্দ্র মজুমদার, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, নীহাররেন্দু দত্ত মজুমদার, কু সী সুদর্শন, মোহনরাও ভাগবত, দত্তোপন্ত ঠেংড়ী, এইচ ভি শেষাদ্রি, নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, সীতানাথ গোস্বামী, অসীম কুমার মিত্র, ভবেন্দু ভট্টাচার্য, কালিদাস বসু, দেবানন্দ ব্রহ্মচারী, পবিত্র কুমার ঘোষ, রমানাথ রায়, অমলেশ মিশ্র, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তথাগত রায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস, জিষ্ণু বসু, শিবপ্রসাদ রায়, ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী, দীনেশ সিংহ, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকের লেখায় সমৃদ্ধ হবে গ্রন্থটি। এটি আগামী অক্টোবর '২৩-এ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা।

গ্রন্থটির মূল্য ধার্য করা হয়েছে ৪০০ টাকা।

প্রকাশ পূর্ব মূল্য ৩০০ টাকা (অর্থাৎ ১৫ আগস্ট, ২০২৩ -এর মধ্যে যাঁরা সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়ে কপি বুক করবেন তাদের জন্য)।

১৫ জুন, ২০২৩ থেকে অনলাইনে ওই টাকা পাঠানো যাবে। অনলাইনে টাকা পাঠালে নীচের দেওয়া ফোন নম্বরে অবশ্যই জানিয়ে দেবেন। জেলা অনুসারে তালিকা-সহ টাকা জমা করতে পারেন।

যোগাযোগ—
শ্রী তপন সাহা — ৯৯০৩০০২৯০১
শ্রী মহিম দাস — ৯৪৭৭৩৯৯২৯৭

অনলাইনে টাকা পাঠানোর Bank Details—

Name - Swastik Prakashan Trust
Bank - Punjab National Bank
Branch- Vivekanand Road, Kolkata-700006
A/c. No. - 0954000100121397
IFS Code - PUNB0095400

বিঃ দ্রঃ— নগদ টাকা স্বস্তিকা দপ্তরেই জমা দিতে হবে।
চেক দিলে Swastik Prakashan Trust—এই নামে চেক কাটতে হবে।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪৩০

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

ড. জয়ন্ত কুশারী

উপন্যাস

প্রবাল, এষা দে, শেখর সেনগুপ্ত

জীবনী

বিজয় আঢ্য, নারায়ণ চক্রবর্তী

পুরাণ কথা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

গল্প

সিদ্ধার্থ সিংহ, সন্দীপ চক্রবর্তী, অনির্বাণ দে, দেবদাস কুণ্ডু,
সমাজ বসু, জয়ন্ত পাল।

প্রবন্ধ

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত রায়, রবীন্দ্র জোশী,
ড. রাজলক্ষ্মী বসু, গোপাল চক্রবর্তী

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

।। চিত্রকথা ।। মহামানব মহানামব্রত ।। ৫৫ ।।

১৯৮৬ সালের ২ এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল কলকাতায় দেশ দেশান্তরের সাধু, গুণীজনেরা সমবেত হন। মহানামব্রতজীর কর্মকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁকে দেওয়া হলো নাগরিক সংবর্ধনা।

শতবর্ষ আগে কলকাতার ডোমপল্লীতে এসে বাস করেছিলেন প্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর। তাদের উন্নতির কথা ভেবেছিলেন তিনি। তাই কর্মীবন্ধুরা দল বেঁধে একটি মন্দির গড়লেন। ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে মন্দিরের উদ্বোধন করলেন মহানামব্রতজী নিজে। নাম হলো শ্রীশ্রী প্রভু জগদ্বন্ধু লীলাঙ্গন।

(ক্রমশ)